শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

করকমলেষু।

চার-ইয়ারী-কথা।

—:০:—

আমরা সেদিন ক্লাবে তাস-খেলায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম যে, রাত্তির যে কত হয়েছে সে দিকে আমাদের কারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজ্‌ল শুনে আমরা চমকে উঠলুম। এরকম গলাভাঙ্গা ঘড়ি কলিকাতা সহরে আর দ্বিতীয় নেই। ভাঙ্গা কাঁসির চাইতেও তার আওয়াজ বেশী বাজখাঁই, এবং সে আওয়াজের রেশ কাণে থেকেই যায়,—আর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অসোয়াস্তি করে। এ ঘড়ির কণ্ঠ আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, কিন্তু সেদিন কেন জানিনে তার খ্যান্‌খ্যানানিটে যেন নূতন করে,' বিশেষ করে,' আমাদের কানে বাজ্‌ল।

হাতের তাস হাতেই রেখে, কি করব ভাবছি—এমন সময়ে সীতেশ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, দুয়োরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন—"Boy, গাড়ী যোত্‌নে বোলো।" পাশের ঘর থেকে উত্তর এল—"যো হুকুম!"

সেন বল্‌লেন—"এত তাড়া কেন? এ হাতটা খেলেই যাও না।"

সীতেশ।—বেশ! দেখছ না কত রাত হয়েছে! আমি আর এক মিনিটও থাক্‌ব না। এম্‌নিই ত বাড়ী গিয়ে বকুনি খেতে হবে!

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলেন—"কার কাছে?"

সীতেশ।—স্ত্রীর—

সোমনাথ উত্তর করলেন—"ঘরে স্ত্রী কি দুনিয়াতে একা তোমারই আছে, আর কারও নেই?"

সীতেশ।—তোমাদের স্ত্রীরা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাড়ীতে তোমরা কখন্ আসো যাও, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

সেন বল্লেন—"সে কথা ঠিক। তবে একদিন একটু দেরী হয়েছে, তার জন্য......"

সীতেশ।—একটু দেরী? আমার মেয়াদ আটটা পর্য্যন্ত—আর এখন দশটা। আর এ-ত একদিন নয়, প্রায় রোজই বাড়ী ফিরতে তোপ পড়ে যায়।

"আর রোজই বকুনি খাও?"

"খাইনে?"

"তাহলে সে-বকুনি ত আর গায়ে লাগবার কথা নয়। এত দিনেও মনে ধাঁটা পড়ে যায় নি?"

সীতেশ।—এখন ইয়ারকি রাখ, আমি চল্লুম—Good night!

এই কথা বলে' তিনি ঘর থেকে বেরতে যাচ্ছেন, এমন সময় Boy এসে খবর দিলে যে, "কোচমান-লোগ আবি গাড়ী যোৎনে নেই মাঙ্গতা। ওলোগ সমজ্‌তা দো দশ মিন্‌টমে জোর পানি আয়েগা, সায়েৎ হাওয়া ভি জোর করেগা। ঘোড়ালোগ আস্তাবলমে খাড়া খাড়া এইসাঁই ডরতা হ্যায়। রাস্তামে নিকালনেসে জরুর ভড়কেগা, সায়েৎ উখড় যায়েগা। কোই আধা ঘণ্টা দেখ্‌কে তব্ সোয়ারি দেনা ঠিক হ্যায়।"

এ কথা শুনে আমরা একটু উতলা হয়ে উঠলুম, কেননা একা সীতেশের নয়, আমাদের সকলেরই বাড়ী যাবার তাড়া ছিল। ঝড়বৃষ্টি আসবার আশু সম্ভাবনা আছে কিনা, তাই দেখবার জন্য আমরা চারজনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম, তাতে আমার বুক চেপে ধরলে, গায়ে কাঁটা দিলে। এ দেশের মেঘলা দিনের এবং মেঘলা রাত্তিরের চেহারা আমরা সবাই চিনি; কিন্তু এ যেন আর এক পৃথিবীর আর এক আকাশ;—দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিম্বা চোখের সুমুখে কোথায়ও ঘনঘটা করে' নেই, আশে-পাশে কোথায়ও মেঘের চাপ নেই; মনে হল যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে, এবং সে রং কালোও নয়, ঘনও নয়; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই-রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যেরকম আলো দেখা যায়, সেইরকম আলো। আকাশ-জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনও দেখিনি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত, স্তম্ভিত, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি,—গাছ-পালা, বাড়ী ঘর-দোর, সব যেন কোনও আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মত দাঁড়িয়ে আছে; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাসছে। মরার মুখে হাসি দেখলে মানুষের মনে যেরকম কৌতূহলমিশ্রিত আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে রাত্তিরের দৃশ্য দেখে আমার মনে ঠিক সেইরকম কৌতূহল ও আতঙ্ক, দুই একসঙ্গে সমান উদয় হয়েছিল। আমার মন চাচ্ছিল যে, হয় ঝড় উঠুক, বৃষ্টি নামুক, বিদ্যুৎ চমকাক্, বজ্র পড়ুক, নয় আরও ঘোর করে আসুক—সব

অন্ধকারে ডুবে যাক্। কেননা প্রকৃতির এই আড়ষ্ট দম-আটকানো ভাব আমার কাছে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে অসহ্য হতে অসহ্যতর হয়ে উঠছিল, অথচ আমি বাইরে থেকে চোখ তুলে নিতে পারছিলুম না;—অবাক হয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কেননা এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার তিনটি বন্ধুই যিনি যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তেমনই দাঁড়িয়ে আছেন; সকলের মুখই গম্ভীর, সকলেই নিস্তব্ধ। আমি এই দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য চীৎকার করে বল্লুম—"Boy, চারঠো আধা peg লাও!" এই কথা শুনে সকলেই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সোমনাথ বল্লেন—আমার জন্য peg নয়, Vermouth।" তার পর আমরা যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সিগ্রেট ধরালুম। আবার সব চুপ। যখন boy peg নিয়ে এসে হাজির হল, তখন সীতেশ বলে উঠ্লেন "মেরা ওয়াস্তে আধা নেই—পূরা।"

আমি হেসে বল্লুম—"I beg your pardon, স্থূল পদার্থের সঙ্গে তরল পদার্থের এ ক্ষেত্রে সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, সে কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম।"

সীতেশ একটু বিরক্ত স্বরে উত্তর করলেন—"তোমাদের মত আমি বামন-অবতারের বংশধর নই।"

—"না, অগস্ত্যমুনির; একচুমুকে তুমি সুরা-সমুদ্র পান করতে পার!"

এ কথা শুনে তিনি মহা বিরক্ত হয়ে বললেন—"দেখো রায়, ও সব বাজে রসিকতা এখন ভাল লাগছে না।" আমি কোনও

উত্তর কর্‌লুম না, কেননা বুঝলুম যে, কথাটা ঠিক। বাইরের ঐ আলো আমাদের মনের ভিতরও প্রবেশ করেছিল, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনের রঙও ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্তমধ্যে আমরা নতুন ভাবের মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। যে সকল মনোভাব নিয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের কারবার, সে সকল মন থেকে ঝরে গিয়ে, তার বদলে দিনের আলোয় যা-কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত হয়ে থাকে, তাই জেগে ও ফুটে উঠেছিল।

সেন বল্লেন—"যেরকম আকাশের গতিক দেখছি, তাতে বোধহয় এখানেই রাত কাটাতে হবে।"

সোমনাথ বল্লেন—"ঘণ্টাখানেক না দেখে ত আর যাওয়া যায় না।"

তারপর সকলে নীরবে ধূমপান করতে লাগলুম।

খানিক পরে সেন আকাশের দিকে চেয়ে যেন নিজের মনে নিজের সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ কর্‌লেন, আমরা একমনে তাই শুন্‌তে লাগলুম।

সেনের কথা

দেখতে পাচ্ছ বাইরে যা-কিছু আছে, চোখের পলকে সব কিরকম নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে; যা জীবন্ত তাও মৃতের মত দেখাচ্ছে; বিশ্বের হৃৎপিণ্ড যেন জড়পিণ্ড হয়ে গেছে, তার বাগ্‌রোধ নিশ্বাসরোধ হয়ে গেছে, রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়েছে; মনে হচ্ছে যেন সব শেষ হয়ে গেছে,—এর পর আর কিছুই নেই। তুমি আমি সকলেই জানি যে, এ কথা সত্য নয়। এই দুষ্ট বিকৃত কলুষিত আলোর মায়াতে আমাদের অভিভূত করে' রেখেছে বলেই এখন আমাদের চোখে, যা সত্য তাও মিছে ঠেকছে। আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের এত অধীন যে, একটু রঙের বদলে আমাদের কাছে বিশ্বের মানে বদ্‌লে যায়। এর প্রমাণ আমি পূর্ব্বেও পেয়েছি। আমি আর একদিন এই আকাশে আর-এক আলো দেখেছিলুম, যার মায়াতে পৃথিবী প্রাণে ভরপূর হয়ে উঠেছিল;—যা মৃত তা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যা মিছে তা সত্য হয়ে উঠেছিল।

সে বহুদিনের কথা। তখন আমি সবে M. A. পাশ করে' বাড়ীতে বসে আছি; কিছু করিনে, কিছু কর্‌বার কথা মনেও করিনে। সংসার চালাবার জন্য আমার টাকা রোজগার করবার আবশ্যকও ছিল না, অভিপ্রায়ও ছিল না। আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল; তা' ছাড়া আমি তখনও বিবাহ করিনি, এবং কখনও যে করব এ কথা আমার মনে স্বপ্নেও স্থান পায়নি। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে চাকরি কিম্বা বিবাহ কর্‌বার জন্য কোনরূপ উৎপাত কর্‌তেন না। সুতরাং কিছু না কর্‌বার স্বাধীনতা আমার সম্পূর্ণ ছিল। এক কথায় আমি জীবনে ছুটি পেয়েছিলুম, এবং সে ছুটি আমি যত-

খুসি তত দীর্ঘ কর্‌তে পারতুম। তোমরা হয়ত মনে করছ যে, এরকম আরাম, এরকম সুখের অবস্থা তোমাদের কপালে ঘটলে, তোমরা আর তার বদল কর্‌তে চাইতে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ অবস্থা সুখের ত নয়ই,—আরামেরও ছিল না। প্রথমতঃ, আমার শরীর তেমন ভাল ছিল না। কোনও বিশেষ অসুখ ছিল না, অথচ একটা প্রচ্ছন্ন জড়তা ক্রমে ক্রমে আমার সমগ্র দেহটি আচ্ছন্ন করে' ফেলছিল। শরীরের ইচ্ছাশক্তি যেন দিন-দিন লোপ পেয়ে আসছিল, প্রতি অঙ্গে আমি একটি অকারণ, একটি অসাধারণ শ্রান্তি বোধ কর্‌তুম। এখন বুঝি, সে হচ্ছে কিছু না করবার শ্রান্তি। সে যাই হোক, ডাক্তাররা আমার বুক পিঠ ঠুকে আবিষ্কার কর্‌লেন যে, আমার যা রোগ তা শরীরের নয়, মনের। কথাটি ঠিক,—তবে মনের অসুখটা যে কি, তা কোন ডাক্তার-কবিরাজের পক্ষে ধরা অসম্ভব ছিল—কেননা যার মন, সেই তা ঠিক ধর্‌তে পারত না। লোকে যাকে বলে দুশ্চিন্তা অর্থাৎ সংসারের ভাবনা, তা আমার ছিল না,—এবং কোনও স্ত্রীলোক আমার হৃদয় চুরি করে পালায়নি। হয়ত শুন্‌লে বিশ্বাস কর্‌বে না, অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, যদিচ তখন আমার পূর্ণ যৌবন, তবুও কোন বঙ্গযুবতী আমার চোখে পড়ে নি। আমার মনের প্রকৃতি এতটা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে, সে মনে কোনও অবলা সরলা ননীবালার প্রবেশাধিকার ছিলনা।

আমার মনে যে সুখ ছিলনা, সোয়াস্তি ছিলনা, তার কারণই ত এই যে, আমার মন সংসার থেকে আল্‌গা হয়ে পড়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, আমার মনে বৈরাগ্য এসেছিল,—অবস্থা ঠিক তার উল্টো। জীবনের প্রতি বিরাগ নয়, আত্যন্তিক

অনুরাগবশতঃই আমার মন চারপাশের সঙ্গে খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল। আমার দেহ ছিল এ দেশে, আর মন ছিল ইউরোপে। সে মনের উপর ইউরোপের আলো পড়েছিল, এবং সে আলোয় স্পষ্ট দেখ্‌তে পেতুম যে, এ দেশে প্রাণ নেই; আমাদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা—সবই তেজোহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ, রুগ্ন, ম্রিয়মাণ এবং মৃতকল্প। আমার চোখে আমাদের সামাজিক জীবন একটি বিরাট পুতুল-নাচের মত দেখাত। নিজে পুতুল সেজে, আর-একটি সালঙ্কারা পুতুলের হাত ধরে, এই পুতুল-সমাজে নৃত্য কর্‌বার কথা মনে করতেও আমার ভয় হ'ত। জানতুম তার-চাইতে মরাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু আমি মর্‌তে চাইনি, আমি চেয়েছিলুম বাঁচতে, —শুধু দেহে নয়, মনেও বেঁচে উঠতে, ফুটে উঠতে, জ্বলে' উঠতে। এই ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় আমার শরীর-মনকে জীর্ণ করে' ফেলছিল, কেননা এই আকাঙ্ক্ষার কোনও স্পষ্ট বিষয় ছিল না, কোনও নির্দ্দিষ্ট অবলম্বন ছিল না। তখন আমার মনের ভিতরে যা ছিল, তা একটি ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং সেই ব্যাকুলতা একটি কাল্পনিক, একটি আদর্শ নায়িকার সৃষ্টি করেছিল। ভাবতুম যে, জীবনে সেই নায়িকার সাক্ষাৎ পেলেই, আমি সজীব হয়ে উঠব। কিন্তু জানতুম এই মরার দেশে সে জীবন্ত রমণীর সাক্ষাৎ কখনো পাব না।

এরকম মনের অবস্থায় আমার অবশ্য চারপাশের কাজকর্ম্ম আমোদ-আহ্লাদ কিছুই ভাল লাগত না,—তাই আমি লোকজন ছেড়ে ইউরোপীয় নাটক-নভেলের রাজ্যে বাস করতুম।—এই রাজ্যের নায়ক-নায়িকারাই আমার রাতদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল, এই কাল্পনিক স্ত্রী-পুরুষেরাই আমার কাছে শরীরী হয়ে

উঠেছিল; আর রক্তমাংসের দেহধারী স্ত্রী-পুরুষেরা আমার চারপাশে সব ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত।) কিন্তু আমার মনের অবস্থা যতই অস্বাভাবিক হোক, আমি আত্মজ্ঞান হারাইনি। আমার এ জ্ঞান ছিল যে, মনের এ বিকার থেকে উদ্ধার না পেলে, আমি দেহ-মনে অমানুষ হয়ে পড়ব। সুতরাং যাতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে আমার পুরো নজর ছিল। আমি জানতুম যে, শরীর সুস্থ রাখতে পারলে, মন সুস্থ আপনিই প্রকৃতিস্থ হয়ে আসবে। তাই আমি রোজ চার-পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতুম। আমার বেড়াবার সময় ছিল সন্ধ্যার পর; কোনদিন খাবার আগে, কোনদিন খাবার পরে। যেদিন খেয়ে-দেয়ে বেড়াতে বেরতুম, সেদিন বাড়ী ফিরতে প্রায় রাত এগারটা বারোটা বেজে যেত। এক রাত্তিরের একটি ঘটনা আমি আজও বিস্মৃত হই নি, বোধ হয় কখনও হতে পারব না,—কেননা আজ পর্যান্ত আমার মনে তা সমান টাট্‌কা রয়েছে।

সেদিন পূর্ণিমা। আমি একলা বেড়াতে বেড়াতে যখন গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন রাত প্রায় এগারটা। রাস্তায় জনমানব ছিল না, তবু আমার বাড়ী ফিরতে মন সরছিল না,—কেননা সেদিন যেরকম জ্যোৎস্না ফুটেছিল, সেরকম জ্যোৎস্না কলিকাতায় বোধ হয় দু-দশবৎসরে এক-আধ দিন দেখা যায়। চাঁদের আলোর ভিতর প্রায়ই দেখা যায় একটা ঘুমন্ত ভাব আছে; সে আলো মাটীতে, জলেতে, ছাদের উপর, গাছের উপর, যেখানে পড়ে সেইখানেই মনে হয় ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু সে রাত্তিরে আকাশে আলোর বাণ ডেকেছিল। চন্দ্রলোক হতে অসংখ্য, অবিরত, অবিরল ও অবিচ্ছিন্ন একটির-পর-একটি, তারপর আর-একটি জ্যোৎস্নার ঢেউ পৃথিবীর উপর এসে ভেঙ্গে পড়ছিল।

এই ঢেউ-খেলানো জ্যোৎস্নায় দিগ্‌দিগন্ত ফেনিল হয়ে উঠেছিল—সে ফেনা শ্যাম্পেনের ফেনার মত আপন হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, তারপরে হাসির আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার মনে এ আলোর নেশা ধরেছিল, আমি তাই নিরুদ্দেশ-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, মনের ভিতর একটি অস্পষ্ট আনন্দ ছাড়া আর কোনও ভাব, কোনও চিন্তা ছিল না।

হঠাৎ নদীর দিকে আমার চোখ পড়্‌ল। দেখি, সারি-সারি জাহাজ এই আলোয় ভাস্‌ছে। জাহাজের গড়ন যে এমন সুন্দর, তা আমি পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করি নি। তাদের ঐ লম্বা ছিপ-ছিপে দেহের প্রতি-রেখায় একটি একটানা গতির চেহারা সাকার হয়ে উঠেছিল,—যে গতির মুখ অসীমের দিকে, আর যার শক্তি অদম্য এবং অপ্রতিহত। মনে হল, যেন কোনও সাগর-পারের রূপকথার রাজ্যের বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীরা উড়ে এসে, এখন পাখা গুটিয়ে জলের উপর শুয়ে আছে—এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে-সঙ্গে তারা আবার পাখা মেলিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবে। সে দেশ ইউরোপ—যে ইউরোপ তুমি-আমি চোখে দেখে এসেছি সে ইউরোপ নয়,—কিন্তু সেই কবি-কল্পিত রাজ্য, যার পরিচয় আমি ইউরোপীয় সাহিত্যে লাভ করেছিলুম। এই জাহাজের ইঙ্গিতে সেই রূপকথার রাজ্য, সেই রূপের রাজ্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে এল। আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখি, আকাশ জুড়ে হাজার-হাজার জ্যাস্‌মিন্ হথরণ্ প্রভৃতি স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠছে, ঝরে পড়্‌ছে, চারিদিকে সাদা ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে। সে ফুল, গাছপালা সব ঢেকে ফেলেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে ঘাসের উপরে পড়েছে, রাস্তাঘাট সব ছেয়ে ফেলেছে। তারপর আমার মনে হল যে, আমি আজ রাত্তিরে কোন মিরাণ্ডা কি ডেস্‌ডিমনা,

বিয়াট্রিস কি টেলার দেখা পাব,—এবং তার স্পর্শে আমি বেঁচে উঠব, জেগে উঠব, অমর হব। আমি কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে, আমার সেই চিরকাঙ্ক্ষিত eternal feminine সশরীরে দূরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন সোজা একদিকে চলে যায়, আমি তেমনি ভাবে চল্‌তে চল্‌তে যখন লাল রাস্তার পাশে এসে পড়লুম, তখন দেখি দূরে যেন একটি ছায়া পায়চারি করছে। আমি সেইদিকে এগোতে লাগলুম। ক্রমে সেই ছায়া শরীরি হয়ে উঠতে লাগল; সে যে মানুষ, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না। যখন অনেকটা কাছে এসে পড়েছি, তখন সে পথের ধারে একটী বেঞ্চিতে বস্‌ল। আরও কাছে এসে দেখি, বেঞ্চিতে যে বসে আছে সে একটী ইংরাজ-রমণী—পূর্ণযৌবনা—অপূর্ব্বসুন্দরী! এমন রূপ মানুষের হয় না;—সে যেন মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা! আমি তার সমুখে থমকে দাঁড়িয়ে, নির্ণিমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখি সেও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন তার চোখের উপর আমার চোখ পড়্‌ল, তখন দেখি তার চোখদুটি আলোয় জ্বল্‌জ্বল্ করছে; মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর-কখনও দেখি নি! সে আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্য্যের নয়,—বিদ্যুতের। সে আলো জ্যোৎস্নাকে আরও উজ্জ্বল করে তুললে, চন্দ্রালোকের বুকের ভিতর যেন তাড়িত সঞ্চারিত হল। বিশ্বের সূক্ষ্মশরীর সেদিন একমুহূর্ত্তের জন্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এ জড়জগৎ সেই মুহূর্ত্তে প্রাণময়, মনোময় হয়ে উঠেছিল। আমি সেদিন ঈথারের স্পন্দন চর্ম্মচক্ষে দেখেছি; আর দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছি যে, আমার আত্মা

ঈথারের সঙ্গে একসুরে, একতানে স্পন্দিত হচ্ছে। এ সবই সেই রাত্তিরের সেই আলোর মায়া। এই মায়ার প্রভাবে শুধু বহির্জগতের নয়,—আমার অন্তর-জগতেরও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল। আমার দেহ-মন মিলেমিশে এক হয়ে একটি মূর্ত্তিমতী বাসনার আকার ধারণ করেছিল, এবং সে হচ্ছে ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার বাসনা। আমার মন্ত্রমুগ্ধ মনে জ্ঞান, বুদ্ধি, এমন কি চৈতন্ত পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছিল।

কতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি আমার দিকে চেয়ে, আমি অচেতন পদার্থের মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে, একটু হাসলে। সেই হাসি দেখে আমার মনে সাহস এল, আমি সেই বেঞ্চিতে তার পাশে বসলুম—গা ঘেঁসে নয়, একটু দূরে। আমরা দুজনেই চুপ করে' ছিলুম। বলা বাহুল্য, তখন আমি চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম; সে স্বপ্ন যে-রাজ্যের, সে-রাজ্যে শব্দ নেই;—যা আছে, তা শুধু নীরব অনুভূতি। আমি যে স্বপ্ন দেখছিলুম, তার প্রধান প্রমাণ এই যে, সে সময় আমার কাছে সকল অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই কলিকাতা সহরে কোন বাঙ্গালী রোমিয়োর ভাগ্যে কোনও বিলাতি জুলিয়েট যে জুটতে পারেনা—এ জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছিলুম।

আমার মনে হচ্ছিল যে, এ স্ত্রীলোকেরও হয়ত আমারই মত মনে সুখ ছিলনা—এবং সে একই কারণে। এর মনও হয়ত এর চারপাশের বণিক-সমাজ হতে আল্‌গা হয়ে পড়েছিল, এবং এও সেই অপরিচিতের আশায়, প্রতীক্ষায়, দিনের পর দিন বিষাদে অবসাদে কাটাচ্ছিল, যার কাছে আত্মসমর্পণ করে' এর জীবন-মন সরাগ সতেজ হয়ে উঠবে। আর আজকের এই কুহকী পূর্ণিমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ডাকে আমরা দুজনেই ঘর থেকে

বেরিয়ে এসেছি। আমাদের এ মিলনের মধ্যে বিধাতার হাত আছে। অনাদিকালে এ মিলনের সূচনা হয়েছিল, এবং অনন্ত-কালেও তার সমাপ্তি হবে না। এই সত্য আবিষ্কার করবামাত্র আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে মুখ ফেরালুম। দেখি, কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বল্‌ছিল, এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে;—একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে;—এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর-কখনও দেখিনি। সে চাহনিতে আমার হৃদয়-মন একেবারে গলে' উথ্‌লে উঠ্‌ল; আমি আস্তে তার এক-খানি জ্যোৎস্নামাখা হাত আমার হাতের কোলে টেনে নিলুম; সে হাতের স্পর্শে আমার সকল শরীর শিহরিত হয়ে উঠ্‌ল, সকল মনের মধ্য দিয়ে একটি আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। আমি চোখ বুজে আমার অন্তরে এই নব-উচ্ছ্বসিত প্রাণের বেদনা অনুভব করতে লাগলুম।

হঠাৎ সে তার হাত আমার হাত থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল! চেয়ে দেখি সে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। একটু এদিক-ওদিক চেয়ে সে দক্ষিণ-দিকে দ্রুতবেগে চল্‌তে আরম্ভ করলে। আমি পিছনদিকে তাকিয়ে দেখি ছ-ফুট-এক-ইঞ্চি লম্বা একটি ইংরেজ, চার-পাঁচজন চাকর সঙ্গে করে' মেয়েটির দিকে জোরে হেঁটে চল্‌ছে। মেয়েটি দু-পা এগোচ্ছে, আবার মুখ ফিরিয়ে দেখছে, আবার এগোচ্ছে, আবার দাঁড়াচ্ছে। এমনি করতে করতে ইংরাজটী যখন তার কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হল, অমনি সে দৌড়তে আরম্ভ করলে। পিছনে পিছনে এরা সকলেও দৌড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে একটি চীৎকার শুনতে পেলুম! সে চীৎকার-ধ্বনি যেমন অস্বাভাবিক,

তেমনি বিকট! সে চীৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল;—আমি যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম, আমার নড়বার চড়বার শক্তি রইল না। তারপর দেখি চার-পাঁচ-জনে চেপে ধরে তাকে আমার দিকে টেনে আনছে; ইংরাজটী সঙ্গে সঙ্গে আসছে। মনে হল, এ অত্যাচারের হাত থেকে একে উদ্ধার করতেই হবে—এই পশুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই হবে; এই মনে করে' আমি যেমন সেইদিকে এগোতে যাচ্ছি, অমনি মেয়েটি হো হো করে হাসতে আরম্ভ করলে! সে অট্টহাস্য চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; সে হাসি তার কান্নার চাইতে দশগুণ বেশী বিকট, দশগুণ বেশী মর্ম্মভেদী। আমি বুঝলুম যে মেয়েটি পাগল,—একেবারে উন্মাদ পাগল,—পাগলা-গারদ থেকে কোনও সুযোগে পালিয়ে এসেছিল, রক্ষকেরা তাকে ফের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই আমার প্রথম ভালবাসা, আর এই আমার শেষ ভাল-বাসা। এর পরে ইউরোপে কত ফুলের-মত কোমল, কত তারার-মত উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি,—ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্টও হয়েছি,—কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমার মন নরম হবার উপক্রম হয়েছে, সেই মুহূর্ত্তে ঐ অট্টহাসি আমার কানে বেজেছে, অমনি আমার মন পাথর হয়ে গেছে। আমি সেইদিন থেকে চিরদিনের জন্য eternal feminineকে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।

এই বলে' সেন তাঁর কথা শেষ করলেন। আমরা সকলে চুপ করে রইলুম। এতক্ষণ সীতেশ চোখ বুজে একখানি আরাম-চৌকির উপর তাঁর ছ-ফুট দেহটি বিস্তার করে লম্বা হয়ে শুয়ে-ছিলেন; তাঁর হস্তচ্যুত আধহাত লম্বা ম্যানিলা চুরুটটি মেজের উপর পড়ে' সধূম দুর্গন্ধ প্রচার করে' তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন আগুনের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছিল। আমি মনে করেছিলুম সীতেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ জলের ভিতর থেকে একটা বড় মাছ যেমন ঘাই-মেরে ওঠে, তেমনি সীতেশ এই নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বস্‌লেন। সেদিনকার সেই রাত্তিরের ছায়ায় তাঁর প্রকাণ্ড দেহ অষ্টধাতুতে গড়া একটি বিরাট বৌদ্ধমূর্ত্তির মত দেখাচ্ছিল। তারপর সেই মূর্ত্তি অতি মিহি মেয়েলি গলায় কথা কইতে আরম্ভ করলেন। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সীতেশের কথা ঠিক তার পুনরাবৃত্তি নয়!

সীতেশের কথা।

তোমরা সকলেই জান, আমার প্রকৃতি সেনের ঠিক উল্টো। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন আপনিই নরম হয়ে আসে। কত সবল শরীরের ভিতর কত দুর্ব্বল মন থাকতে পারে, তোমাদের মতে আমি তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ। বিলেতে আমি মাসে একবার-করে' নূতন করে' ভালবাসায় পড়তুম; তার জন্য তোমরা আমাকে কত-না ঠাট্টা করেছ, এবং তার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে কত-না তর্ক করেছি। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের মন বুঝে দেখেছি যে, তোমরা যা বলতে তা ঠিক। আমি যে সেকালে, দিনে একবার-করে' ভালবাসায় পড়ি নি, এতেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই! স্ত্রীজাতির দেহ এবং মনের ভিতর এমন-একটি শক্তি আছে, যা আমার দেহমনকে নিত্য টানে। সে আকর্ষণী-শক্তি কারও বা চোখের চাহনীতে থাকে, কারও বা মুখের হাসিতে, কারও বা গলার স্বরে, কারও বা দেহের গঠনে।* এমন কি, শ্রীঅঙ্গের কাপড়ের রঙে, গহনার ঝঙ্কারেও আমার বিশ্বাস যাদু আছে। মনে আছে, একদিন একজনকে দেখে আমি কাতর হয়ে পড়ি, সেদিন সে ফলসাই-রঙের কাপড় পরেছিল—তারপরে তাকে আর একদিন আসমানি-রঙের কাপড়-পরা দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম। এ রোগ আমার আজও সম্পূর্ণ সারে নি। আজও আমি মলের শব্দ শুনলে কান খাড়া করি, রাস্তায় কোন বন্ধ গাড়িতে খড়খড়ি তোলা রয়েছে দেখলে আমার চোখ আপনিই সেদিকে যায়; গ্রীক্ Statueর মত গড়নের কোনও হিন্দুস্থানী রমণীকে পথে ঘাটে পিছন থেকে দেখলে আমি ঘাড় বাঁকিয়ে একবার তার মুখটি দেখে নেবার চেষ্টা করি। তা ছাড়া, সেকালে আমার

মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি হচ্ছি সেইজাতের পুরুষমানুষ, যাদের প্রতি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই অনুরক্ত হয়। এ সত্ত্বেও যে আমি নিজের কিম্বা পরের সর্ব্বনাশ করি নি, তার কারণ Don Juan হবার মত সাহস ও শক্তি আমার শরীরে আজও নেই, কখন ছিলও না। দুনিয়ার যত সুন্দরী আজও রীতিনীতির কাঁচের আলমারির ভিতর পোরা রয়েছে,—অর্থাৎ তাদের দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। আমি যে ইহজীবনে এই আলমারির একখানা কাঁচও ভাঙিনি, তার কারণ ও-বস্তু ভাঙলে প্রথমতঃ বড় আওয়াজ হয়—তার ঝন্‌ঝনানি পাড়া মাথায় কোরে তোলে; দ্বিতীয়তঃ তাতে হাত পা কাটবার ভয়ও আছে। আসল কথা, সেন eternal feminine একের ভিতর পেতে চেয়েছিলেন—আর আমি অনেকের ভিতর। ফল সমানই হয়েছে। তিনিও তা পাননি, আমিও পাই নি। তবে দুজনের ভিতর তফাৎ এই যে, সেনের মত কঠিন মন কোনও স্ত্রীলোকের হাতে পড়্‌লে, সে তাতে বাটালি দিয়ে নিজের নাম ক্ষুদে রেখে যায়; কিন্তু আমার মত তরল মনে, স্ত্রীলোকমাত্রেই তার আঙ্গুল ডুবিয়ে যা-খুসি হিজিবিজি করে' দাঁড়ি টান্‌তে পারে, সেই সঙ্গে সে-মনকে ক্ষণিকের তরে ঈষৎ চঞ্চল করে'ও তুল্‌তে পারে—কিন্তু কোনও দাগ রেখে যেতে পারে না; সে অঙ্গুলিও সরে যায়—তার রেখাও মিলিয়ে যায়। তাই আজ দেখ্‌তে পাই আমার স্মৃতিপটে একটি-ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের স্পষ্ট ছবি নেই। একটি দিনের একটি ঘটনা আজও ভুল্‌তে পারিনি, কেননা এক জীবনে এমন ঘটনা দু'বার ঘটে না।

আমি তখন লণ্ডনে। মাসটি ঠিক মনে নেই; বোধহয় অক্টোবরের শেষ, কিম্বা নভেম্বরের প্রথম। কেননা এইটুকু

মনে আছে যে, তখন চিম্‌নিতে আগুন দেখা দিয়েছে। আমি একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সন্ধ্যে হয়েছে;—যেন সূর্য্যের আলো নিভে গেছে, অথচ গ্যাসের বাতি জ্বালা হয় নি। ব্যাপারখানা কি বোঝবার জন্য জানালার কাছে গিয়ে দেখি, রাস্তায় যত লোক চলেছে সকলের মুখই ছাতায় ঢাকা। তাদের ভিতর পুরুষ স্ত্রীলোক চেনা যাচ্ছে শুধু কাপড় ও চালের তফাতে। যাঁরা ছাতার ভিতর মাথা গুঁজে, কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে', হন্‌হন্ করে' চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা পুরুষ; আর যাঁরা ডানহাতে ছাতা ধরে বাঁহাতে গাউন হাঁটুপর্য্যন্ত তুলে ধরে কাদাখোঁচার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা স্ত্রীলোক। এই থেকে আন্দাজ করলুম বৃষ্টি সুরু হয়েছে; কেননা এ বৃষ্টির ধারা এত সূক্ষ্ম যে তা চোখে দেখা যায় না, আর এত ক্ষীণ যে তা কানে শোনা যায় না।

ভাল কথা, এ জিনিষ কখনও নজর করে দেখেছ কি যে, বর্ষার দিনে বিলেতে কখনও মেঘ করে না? আকাশটা শুধু আগাগোড়া ঘুলিয়ে যায়, এবং তার ছোঁয়াচ লেগে গাছপালা সব নেতিয়ে পড়ে, রাস্তাঘাট সব কাদায় প্যাচ্‌প্যাচ্ করে। মনে হয় যে, এ বর্ষার আধখানা উপর থেকে নামে, আর আধখানা নীচে থেকেও ওঠে, আর দুইয়ে মিলে আকাশময় একটা বিশ্রী অস্পৃশ্য নোংরা ব্যাপারের সৃষ্টি করে। সকালে উঠেই দিনের এই চেহারা দেখে যে একদম মন-মরা হয়ে গেলুম, সে কথা বলা বাহুল্য। এরকম দিনে, ইংরাজরা বলেন তাঁদের খুন করবার ইচ্ছে যায়; সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমার একজনের সঙ্গে Richmondএ যাবার কথা ছিল, কিন্তু এমন দিনে ঘর থেকে বেরবার প্রবৃত্তি হল না। কাজেই ব্রেক্‌ফাষ্ট খেয়ে Times নিয়ে পড়তে বসলুম। আমি সেদিন ও-কাগজের প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্যান্ত পড়লুম; এক কথাও বাদ দিইনি। সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করি যে, Times-এর শাঁসের চাইতে তার খোসা, তার প্রবন্ধের চাইতে তার বিজ্ঞাপন ঢের বেশী মুখরোচক! তার আর্টিকেল পড়লে মনে যা হয়, তার নাম রাগ; আর তার আড্‌ভার্টিস্‌মেণ্ট পড়লে মনে যা হয়, তার নাম লোভ। সে যাই হোক, কাগজ-পড়া শেষ হতে-না-হতেই, দাসী লাঞ্চ এনে হাজির করলে; যেখানে বসেছিলুম, সেইখানে বসেই তা শেষ করলুম। তখন দুটো বেজেছে। অথচ বাইরের চেহারার কোনও বদল হয় নি, কেননা এই বিলেতী বৃষ্টি ভাল করে' পড়তেও জানে না, ছাড়তেও জানে না। তকাতের মধ্যে দেখি যে, আলো ক্রমে এত কমে এসেছে যে, বাতি না জ্বেলে ছাপার অক্ষর আর পড়বার জো নেই।

আমি কি করব ঠিক করতে না পেরে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে সুরু করলুম, খাণিকক্ষণ পরে তাতেও বিরক্তি ধরে' এল। ঘরের গ্যাস জ্বেলে আবার পড়তে বসলুম। প্রথমে নিলুম আইনের বই—Ansonএর Contract। এক কথা দশ বার করে' পড়লুম, অথচ offer এবং acceptance-এর এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। আমি জিজ্ঞেস করলুম "তুমি এতে রাজি?" তুমি উত্তর করলে "আমি ওতে রাজি।"—এই সোজা জিনিষটেকে মানুষ কি জটিল করে' তুলেছে, তা' দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লুম! মানুষে যদি কথা দিয়ে

কথা রাখত, তাহলে এই সব পাপের বোঝা আমাদের আর বইতে হত না। তাঁর খুরে দণ্ডবৎ করে Ansonকে সেল্‌ফের সর্ব্বোচ্চ থাকে তুলে রাখলুম। নজরে পড়ল সুমুখে একখানা পুরোনো Punch পড়ে' রয়েছে। তাই নিয়ে ফের বসে গেলুম। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন Punch পড়ে' হাসি পাওয়া দূরে থাক, রাগ হতে লাগল। এমন কলে-তৈরী রসিকতাও যে মানুষে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে, এই ভেবে অবাক হলুম! দিব্যচক্ষে দেখতে পেলুম যে, পৃথিবীর এমন দিনও আসবে, যখন Made in Germany এই ছাপমারা রসিকতাও বাজারে দেদার কাটবে। সে যাই হোক, আমার চৈতন্য হল যে, এ দেশের আকাশের মত এ দেশের মনেও বিদ্যুৎ কালে-ভদ্রে এক-আধবার দেখা দেয়— তাও আবার যেমন ফ্যাকাসে, তেমনি এলো। যেই এই কথা মনে হওয়া, অমনি Punchখানি চিম্‌নির ভিতর গুঁজে দিলুম,—তার আগুন আনন্দে হেসে উঠল। একটি জড়পদার্থ Punchএর মান রাখলে দেখে খুসী হলুম!

তারপর চিম্‌নির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট-দশেক আগুন পোহালুম। তারপর আবার একখানি বই নিয়ে পড়তে বসলুম। এবার নভেল। খুলেই দেখি ডিনারের বর্ণনা। টেবিলের উপর সারি সারি রূপোর বাতিদান, গাদা গাদা রূপোর বাসন, ডজন ডজন হীরের মত পল-কাটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কাঁচের গেলাস। আর সেই সব গেলাসের ভিতর, স্পেনের ফ্রান্সের জর্ম্মনির মদ,—তার কোনটির রঙ চুনির, কোনটির পান্নার, কোনটির পোখরাজের। এ নভেলের নায়কের নাম Algernon, নায়িকার Millicent। একজন Dukeএর ছেলে, আর একজন millionaireএর মেয়ে; রূপে Algernon

বিদ্যাধর, Millicent বিদ্যাধরী। কিছুদিন হল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়েছেন, এবং সে প্রণয় অতি পবিত্র, অতি মধুর, অতি গভীর। এই ডিনারে Algernon বিবাহের offer করবেন, Millicent তা accept করবেন—contract পাকা হয়ে যাবে!

সেকালে কোনও বর্ষার দিনে কালিদাসের আত্মা যেমন মেঘে চড়ে' অলকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই দুর্দ্দিনে আমার আত্মাও তেমনি কুয়াসায় ভর করে' এই নভেল-বর্ণিত রূপোর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। কল্পনার চক্ষে দেখলুম, সেখানে একটি যুবতী,—বিরহিণী যক্ষ-পত্নীর মত,—আমার পথচেয়ে বসে আছে। আর তার রূপ! তা বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সে যেন হীরামাণিক দিয়ে সাজানো সোণার প্রতিমা। বলা বাহুল্য যে, চারচক্ষুর মিলন হবা-মাত্রই আমার মনে ভালবাসা উথলে উঠল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার মনপ্রাণ তার হাতে সমর্পণ করলুম। সে সস্নেহে সাদরে তা গ্রহণ করলে। ফলে, যা পেলুম তা শুধু যক্ষকন্যা নয়, সেই সঙ্গে যক্ষের ধন। এমন সময় ঘড়িতে টং টং করে চারটে বাজল,—অমনি আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, যেখানে আছি সে রূপকথার রাজ্য নয়, কিন্তু একটা স্যাৎসেঁতে অন্ধকার জল-কাদার দেশ। আর একা ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল; আমি টুপি ছাতা ওভারকোট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

জানই ত, জলই হোক, ঝড়ই হোক, লণ্ডনের রাস্তায় লোক-চলাচল কখনও বন্ধ হয় না,—সেদিনও হয় নি। যতদূর চোখ যায় দেখি, শুধু মানুষের স্রোত চলেছে—সকলেরই পরণে

কালো কাপড়, মাথায় কালো টুপি, পায়ে কালো জুতো, হাতে কালো ছাতা। হঠাৎ দেখ্‌তে মনে হয় যেন অসংখ্য অগণ্য Daguerrotype-এর ছবি বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। এই লোকারণ্যের ভিতর, ঘরের চাইতে আমার বেশী একলা মনে হতে লাগল, কেননা এই হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এমন একজনও ছিল্ না যাকে আমি চিনি, যার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি; অথচ সেই মুহূর্ত্তে মানুষের সঙ্গে কথা কইবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত আবশ্যক, তা এইরকম দিনে এইরকম অবস্থায় পুরো বোঝা যায়।

নিরুদ্দেশ-ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি Holborn Circus-এর কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলুম। সুমুখে দেখি একটি ছোট পুরোনো বইয়ের দোকান, আর তার ভিতরে একটি জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ গ্যাসের বাতির নীচে বসে আছে। তার গায়ের ফ্রক্-কোটের বয়েস বোধহয় তার চাইতেও বেশি। যা বয়স-কালে কালো ছিল, এখন তা হল্‌দে হয়ে উঠেছে। আমি অন্যমনস্ক-ভাবে সেই দোকানে ঢুকে পড়লুম। বৃদ্ধটী শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তার রকম দেখে মনে হল যে, আমার মত সৌখীন পোষাক-পরা খদ্দের ইতিপূর্ব্বে তার দোকানের ছায়া কখনই মাড়ায় নি। এ-বই ও-বই সে-বইয়ের ধূলো ঝেড়ে, সে আমার সুমুখে নিয়ে এসে ধরতে লাগল। আমি তাকে স্থির থাক্‌তে বলে', নিজেই এখান-থেকে সেখান-থেকে বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে সুরু করলুম। কোন বইয়ের বা পাঁচমিনিট ধরে' ছবি দেখলুম, কোন বইয়ের বা দু-চার লাইন পড়েও

ফেল্‌লুম। পুরোনো বই-ঘাঁটার ভিতর যে একটু আমোদ আছে, তা তোমরা সবাই জান। আমি এক-মনে সেই আনন্দ উপভোগ করছি, এমন সময়ে হঠাৎ এই ঘরের ভিতর কি-জানি কোথা থেকে একটি মিষ্টি গন্ধ, বর্ষার দিনে বসন্তের হাওয়ার মত ভেসে এল। সে গন্ধ যেমন ক্ষীণ তেমনি তীক্ষ্ণ,—এ সেই জাতের গন্ধ যা অলক্ষিতে তোমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে, আর সমস্ত অন্তরাত্মাকে উতলা করে তোলে। এ গন্ধ ফুলের নয়; কেননা ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, আকাশে হারিয়ে যায়; তার কোনও মুখ নেই। কিন্তু এ সেই-জাতীয় গন্ধ, যা একটি সূক্ষ্মরেখা ধরে ছুটে আসে, একটি অদৃশ্য তীরের মত বুকের ভিতর গিয়ে বেঁধে। বুঝলুম এ গন্ধ হয় মৃগনাভি কস্তুরির, নয় পাচুলির,—অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহ থেকে এ গন্ধের উৎপত্তি। আমি একটু ত্রস্ত-ভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, পিছনে গলা থেকে পা পর্যন্ত আগা-গোড়া কালো কাপড়পরা একটি স্ত্রীলোক, লোহে ভর দিয়ে সাপের মত, ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার দিকে হাঁ-করে' চেয়ে রয়েছি দেখে, সে চোখ ফেরালে না। পূর্ব্বপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যেরকম করে' হাসে, সেইরকম মুখ-টিপে-টিপে হাসতে লাগল,—অথচ আমি হলপ করে বলতে পারি যে, এ-স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার কস্মিনকালেও দেখা হয় নি। আমি এই হাসির রহস্য বুঝতে না পেরে, ঈষৎ অপ্রতিভভাবে তার দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে, একখানি বই খুলে দেখতে লাগলুম। কিন্তু তার একছত্রও আমার চোখে পড়ল না। আমার মনে হতে লাগল যে, তার চোখ-দুটি যেন ছুরির মত আমার পিঠে বিঁধছে। এতে আমার এত অসোয়াস্তি করতে লাগল যে, আমি আবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালুম।

দেখি সেই মুখটেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে। ভাল করে' নিরীক্ষণ করে' দেখলুম যে, এ হাসি তার মুখের নয়,—চোখের। ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মত চিক্‌মিক করছে। আমি সে দৃষ্টি এড়াবার যতবার চেষ্টা করলুম, আমার চোখ ততবার ফিরে ফিরে সেইদিকেই গেল। শুন্‌তে পাই, কোন কোন সাপের চোখে এমন আকর্ষণী-শক্তি আছে, যার টানে গাছের পাখী মাটিতে নেমে আসে,—হাজার পাখা-ঝাপটা দিয়েও উড়ে যেতে পারে না। আমার মনের অবস্থা ঐ পাখীর মতই হয়েছিল।

বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে আমার মনে নেশা ধরেছিল,—ঐ পাচুলির গন্ধ আর ঐ চোখের আলো, এই দুইয়ে মিশে আমার শরীর-মন দুই উত্তেজিত করে' তুলেছিল। আমার মাথার ঠিক ছিল না, সুতরাং তখন যে কি করছিলুম তা আমি জানিনে। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, হঠাৎ তার গায়ে আমার গায়ে ধাক্কা লাগল। আমি মাপ চাইলুম; সে হাসিমুখে উত্তর করলে—"আমার দোষ, তোমার নয়।" তার গলার স্বরে আমার বুকের ভিতর কি-যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল, কেননা সে আওয়াজ বাঁশির নয়, তারের যন্ত্রের। তাতে জোয়ারি ছিল। এই কথার পর আমরা এমনভাবে পরস্পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলুম, যেন আমরা দুজনে কতকালের বন্ধু। আমি তাকে এ-বইয়ের ছবি দেখাই, সে আর-একখানি বই টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে আমি তা পড়েছি কিনা। এই করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল তা জানিনে। তার কথাবার্ত্তায় বুঝলুম যে, তার পড়াশুনো আমার-চাইতে ঢের বেশি। জর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, তিন

ভাষার সঙ্গেই দেখলুম তার সমান পরিচয় আছে। আমি ফ্রেঞ্চ জানতুম, তাই নিজের বিছে দেখাবার জন্যে একখানি ফরাসি কেতাব তুলে নিয়ে, ঠিক তার মাঝখানে খুলে পড়্‌তে লাগলুম; সে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে, আমার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল, আমি কি পড়চি। আমার কাঁধে তার চিবুক, আমার গালে তার চুল স্পর্শ করছিল; সে স্পর্শে ফুলের কোমলতা, ফুলের গন্ধ ছিল; কিন্তু এই স্পর্শে আমার শরীর-মনে আগুন ধরিয়ে দিলে।

ফরাসি বইখানির যা পড়ছিলুম, তা হচ্ছে একটি কবিতা—

> Si vous n'avez rien à me dire,
> Pourquoi venir auprès de moi ?
> Pourquoi me faire ce sourire
> Qui tournerait la tête au roi." ?

এর মোটামুটি অর্থ এই—"যদি আমাকে তোমার বিশেষ কিছু বলবার না থাকে ত আমার কাছে এলেই বা কেন, আর অমন করে হাসলেই বা কেন, যাতে রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে যায়!"

আমি কি পড়ছি দেখে সুন্দরী ফিক্ করে' হেসে উঠল। সে হাসির ঝাপ্‌টা আমার মুখে লাগল, আমি চোখে ঝাপ্‌সা দেখ্‌তে লাগলুম। আমার পড়া আর এগলো না। ছোট ছেলেতে যেমন কোন অন্যায় কাজ করতে ধরা পড়্‌লে শুধু হেলে দোলে বাঁকে-চোরে, অপ্রতিভভাবে এদিক ওদিক চায়, আর কোনও কথা বল্‌তে পারে না,—আমার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

আমি বইখানি বন্ধ করে' বৃদ্ধকে ডেকে তার দাম জিজ্ঞেস করলুম। সে বল্লে, এক শিলিং। আমি বুকের পকেট থেকে

একটি মরক্কোর পকেট-কেস্ বার করে' দাম দিতে গিয়ে দেখি যে; তার ভিতর আছে শুধু পাঁচটি গিনি ;—একটিও শিলিং নেই। আমি এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে কোথায়ও একটি শিলিং পেলুম না। এই সময়ে আমার নব-পরিচিতা নিজের পকেট থেকে একটি শিলিং বার করে', বৃদ্ধের হাতে দিয়ে আমাকে বল্লে—"তোমার আর গিনি ভাঙ্গাতে হবে না, ও-বইখানি আমি নেব।" আমি বল্লুম—"তা হবে না।" তাতে সে হেসে বল্লে—"আজ থাক, আবার যেদিন দেখা হবে সেইদিন তুমি টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।"

এর পরে আমরা দুজনেই বাইরে চলে এলুম। রাস্তায় এসে আমার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে—"এখন তোমার বিশেষ-করে' কোথায়ও যাবার আছে ?" আমি বল্লুম—"না।"

—"তবে চল Oxford Circus পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দাও। লণ্ডনের রাস্তায় একা চল্‌তে হলে সুন্দরী স্ত্রীলোককে অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হয়।"

এ প্রস্তাব শুনে আমার মনে হল, রমণীটি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—"কেন ?"

—"তার কারণ পুরুষমানুষ হচ্ছে বাঁদরের জাত। রাস্তায় যদি কোনও মেয়ে একা চলে, আর তার যদি রূপযৌবন থাকে, তাহলে হাজার পুরুষের মধ্যে পাঁচশ'জন তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে, পঞ্চাশজন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসবে, পাঁচজন গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করবে, আর অন্ততঃ একজন এসে বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

—"এই যদি আমাদের স্বভাব হয় ত কি ভরসায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ ?"

সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"তোমাকে আমি ভয় করিনে।"

—"কেন ?"

—"বাঁদর ছাড়া আর-এক জাতের পুরুষ আছে,—যারা আমাদের রক্ষক।"

—"সে জাতটি কি ?"

—"যদি রাগ না কর ত বলি। কারণ কথাটা সত্য হলেও, প্রিয় নয়।"

—"তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পার—কেননা তোমার উপর রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

—"সে হচ্ছে পোষা-কুকুরের জাত। এ জাতের পুরুষরা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, মুখের দিকে ক্যাল্‌ক্যাল্ করে' চেয়ে থাকে, গায়ে হাত দিলে আনন্দে লেজ নাড়ায়, আর অপর-কোনও পুরুষকে আমাদের কাছে আস্‌তে দেয় না। বাইরের লোক দেখলেই প্রথমে গোঁ গোঁ করে, তারপর দাঁত বার করে,—তাতেও যদি সে পিঠটান না দেয়, তাহলে তাকে কামড়ায়।"

আমি কি উত্তর করব না ভেবে পেয়ে বল্লুম—"তোমার দেখছি আমার জাতের উপর ভক্তি খুব বেশী।"

সে আমার মুখের উপর তার চোখ রেখে উত্তর করলে—"ভক্তি না থাক, ভালবাসা আছে।" আমার মনে হল তার চোখ তার কথায় সায় দিচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা Oxford Circus-এর দিকে চলেছিলুম,

কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারি নি, কেননা দুজনেই খুব আস্তে হাঁটছিলুম।

তার শেষ কথাগুলি শুনে আমি খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলুম। তারপর যা জিজ্ঞেস করলুম, তার থেকে বুঝতে পারবে যে তখন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা লোপ পেয়েছিল।

আমি।—"তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে?"

"—কখনই না।"

—"এই যে একটু আগে বল্‌লে যে আবার যেদিন দেখা হবে..."

—"সে তুমি শিলিংটে নিতে ইতস্ততঃ করছিলে বলে'।"

এই বলে' সে আমার দিকে চাইলে। দেখি তার মুখে সেই হাসি—যে-হাসির অর্থ আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারি নি।

আমি তখন নিশাপে-পাওয়া লোকের মত জ্ঞানহারা হয়ে চল্‌ছিলুম। তার সকল কথা আমার কানে ঢুকলেও, মনে ঢুকছিল না।

তাই আমি তার হাসির উত্তরে বল্‌লুম—"তুমি না চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চাই।"

—"কেন? আমার সঙ্গে তোমার কোনও কাজ আছে?"

—"শুধু দেখা-করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই;—আসল কথা এই যে, তোমাকে না দেখে আমি আর থাকতে পারব না।"

—"এ কথা যে-বইয়ে পড়েছ সেটি নাটক না নভেল?"

—"পরের বই থেকে বল্‌ছি নে, নিজের মন থেকে। যা বল্‌ছি তা সম্পূর্ণ সত্য।"

—"তোমার বয়সের লোক নিজের মন জানে না; মনের সত্য-মিথ্যা চিনতেও সময় লাগে। ছোট ছেলের যেমন মিষ্টি

দেখলেই খাবার লোভ হয়, বিশ-একুশ বৎসর বয়সের বড় ছেলেদেরও তেমনি মেয়ে দেখলেই ভালবাসা হয়। ও-সব হচ্ছে যৌবনের তুষ্ট ক্ষিধে।"

—"তুমি যা বলচ তা হয় ত সত্য। কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমার কাছে আজ বসন্তের হাওয়ার মত এসেচ, আমার মনের মধ্যে আজ ফুল ফুটে উঠেচে।"

—"ও হচ্ছে যৌবনের season flower, দুদণ্ডেই ঝরে যায়, —ও-ফুলে কোনও ফল ধরে না।"

—"যদি তাই হয় ত, যে ফুল তুমি ফুটিয়েচ তার দিকে মুখ ফেরাচ্ছ কেন? ওর প্রাণ দুদণ্ডের কি চিরদিনের, তার পরিচয় শুধু ভবিষ্যতই দিতে পারে।"

এই কথা শুনে সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পাঁচমিনিট চুপ করে' থেকে বল্লে—"তুমি কি ভাবচ যে তুমি পৃথিবীর পথে আমার পিছু-পিছু চিরকাল চল্‌তে পারবে?"

—"আমার বিশ্বাস পারব।

—"আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা না জেনে?"

—"তোমার আলোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

—"আমি যদি আলেয়া হই! তাহলে তুমি একদিন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে শুধু কেঁদে বেড়াবে।"

আমার মনে এ কথার কোনও উত্তর জোগাল না। আমি নীরব হয়ে গেলুম দেখে সে বল্লে—"তোমার মুখে এমন-একটি সরলতার চেহারা আছে যে, আমি বুঝতে পাচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে তোমার মনের কথাই বলচ। সেই জন্যই আমি তোমার জীবন আমার সঙ্গে জড়াতে চাই নে। তাতে শুধু কষ্ট পাবে। যে কষ্ট আমি বহু লোককে দিয়েছি, সে কষ্ট আমি তোমাকে

দিতে চাই নে ;—প্রথমতঃ তুমি বিদেশী, তারপর তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন।”

এতক্ষণে আমরা Oxford Circus-এ এসে পৌঁছলুম। আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বল্লুম—“আমি নিজের মন দিয়ে জানচি যে, তোমাকে হারানোর চাইতে আমার পক্ষে আর কিছু বেশী কষ্ট হতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি আমাকে কষ্ট না দিতে চাও, তাহলে বল আবার কবে আমার সঙ্গে দেখা করবে।”

সম্ভবতঃ আমার কথার ভিতর এমন একটা কাতরতা ছিল, যা তার মনকে স্পর্শ করলে। তার চোখের দিকে চেয়ে বুঝলুম যে, তার মনে আমার প্রতি একটু মায়া জন্মেছে। সে বল্লে—“আচ্ছা তোমার কার্ড দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব।”

আমি অমনি আমার পকেট-কেস্ থেকে একখানি কার্ড বার করে' তার হাতে দিলুম। তারপর আমি তার কার্ড চাইলে সে উত্তর দিলে—“সঙ্গে নেই।” আমি তার নাম জানবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলুম, সে কিছুতেই বল্‌তে রাজি হল না। শেষটা অনেক কাকুতি-মিনতি করবার পর বল্লে—“তোমার একখানি কার্ড দাও, তার গায়ে লিখে দিচ্ছি ; কিন্তু তোমার কথা দিতে হবে সাড়ে-ছটার আগে তুমি তা দেখ্‌বে না।”

তখন ছটা বেজে বিশ মিনিট। আমি দশ মিনিট ধৈর্য্য ধরে' থাক্‌তে প্রতিশ্রুত হলুম। সে তখন আমার পকেট-কেসটি আমার হাত থেকে নিয়ে, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, একখানি কার্ড বার করে' তার উপর পেন্সিল দিয়ে কি লিখে, আবার সেখানি পকেট-কেসের ভিতর রেখে, কেসটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েই, পাশে যে ক্যাবখানি দাঁড়িয়ে ছিল তার উপর

লাফিয়ে উঠে সোজা মার্বেল আর্চের দিকে হাঁকাতে বললে। দেখতে-না-দেখতে ক্যাবখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি Regent Street-এ ঢুকে, প্রথম যে restaurant চোখে পড়ল তার ভিতর প্রবেশ করে', এক পাইন্ট শ্যাম্পেন নিয়ে বসে গেলুম। মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখতে লাগলুম। দশ মিনিট দশ ঘণ্টা মনে হল। যেই সাড়ে-ছ'টা বাজা, অমনি আমি পকেট-কেস খুলে যা দেখলুম, তাতে আমার ভালবাসা আর শ্যাম্পেনের নেশা একসঙ্গে ছুটে গেল। দেখি কার্ডখানি রয়েছে, গিনি ক'টি নেই! কার্ডের উপর অতি সুন্দর স্ত্রীহস্তে এই ক'টি কথা লেখা ছিল—

"পুরুষমানুষের ভালবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশী আবশ্যক। যদি তুমি আমার কখনও খোঁজ না কর, তাহলে যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।"

আমি অবশ্য তার খোঁজ নিজেও করিনি, পুলিশ দিয়েও করাই নি। শুনে আশ্চর্য হবে, সেদিন আমার মনে রাগ হয় নি, দুঃখ হয়েছিল,—তাও আবার নিজের জন্য নয়, তার জন্য।

সোমনাথ এতক্ষণ, যেমন তাঁর অভ্যাস, একটির পর আর একটি অনবরত সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুখের সুমুখে ধোঁয়ার একটি ছোটখাটো মেঘ জমে গিয়েছিল। তিনি একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়েছিলেন,—এমন ভাবে, যেন সেই ধোঁয়ার ভিতর তিনি কোন নূতন তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। পূর্ব্ব পরিচয়ে আমাদের জানা ছিল যে, সোমনাথকে যখন সবচেয়ে অন্যমনস্ক দেখায়, ঠিক তখনি তাঁর মন সব চেয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকে,—সে সময়ে একটি কথাও তাঁর কান এড়িয়ে যায় না, একটি জিনিষও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না। সোমনাথের চাঁচাছোলা মুখটি ছিল ঘড়ির dialএর মত, অর্থাৎ তার ভিতরকার কলটি যখন পুরোদমে চল্‌ছে তখনও সে মুখের তিলমাত্র বদল হ'ত না, তার একটি রেখাও বিকৃত হ'ত না। তাঁর এই আত্মসংযমের ভিতর অবশ্য আর্ট ছিল। সীতেশ তাঁর কথা শেষ কর্‌তে না কর্‌তেই সোমনাথ ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত কর্‌লেন। আমরা বুঝলুম সোমনাথ তার মর্ম্মের ধনুকে ছিলে চড়ালেন, এইবার শরবর্ষণ আরম্ভ হবে। আমাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। তিনি ডান হাতের সিগারেট বাঁ হাতে বদলি করে' দিয়ে, অতি মোলায়েম অথচ অতি দানাদার গলায় তাঁর কথা আরম্ভ কর্‌লেন। লোকে যেমন করে' গানের গলা তৈরি করে, সোমনাথ তেমনি করে' কথার গলা তৈরি করেছিলেন,—সে কণ্ঠস্বরে কর্কশতা কিম্বা জড়তার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর উচ্চারণ এত পরিষ্কার যে, তাঁর মুখের কথার প্রতি-অক্ষর গুণে নেওয়া যেত। আমাদের এ বন্ধুটি সহজ মানুষের মত সহজভাবে কথা-বার্ত্তা কইবার অভ্যাস অতি অল্প বয়সেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর গোঁফ না উঠতেই চুল পেকেছিল। তিনি সময় বুঝে

মিতভাষী বা বহুভাষী হতেন। তাঁর অল্পকথা তিনি বল্‌তেন শানিয়ে, আর বেশী কথা সাজিয়ে। সোমনাথের ভাবগতিক দেখে আমরা একটি লম্বা বক্তৃতা শোনবার জন্য প্রস্তুত হলুম। অমনি আমাদের চোখ সোমনাথের মুখ থেকে নেমে তাঁর হাতের উপর গিয়ে পড়্‌ল। আমরা জানতুম যে তিনি তাঁর আঙ্গুল ক'টিকেও তাঁর কথার সঙ্গৎ করতে শিখিয়েছিলেন।

সোমনাথের কথা।

তোমরা আমাকে বরাবর ফিলজফার বলে' ঠাট্টা করে' এসেছ, আমিও অদ্যাবধি সে অপবাদ বিনা আপত্তিতে মাথা পেতে নিয়েছি। রমণী যদি কবিত্বের একমাত্র আধার হয়, আর যে কবি নয় সেই যদি ফিলজফার হয়, তাহলে আমি অবশ্য ফিলজফার হয়েই জন্মগ্রহণ করি। কি কৈশোরে, কি যৌবনে, স্ত্রীজাতির প্রতি আমার মনের কোনরূপ টান ছিল না। ও জাতি আমার মন কিম্বা ইন্দ্রিয় কোনটিই স্পর্শ করতে পারত না। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন নরমও হ'ত না, শক্তও হ'ত না। আমি ও-জাতীয় জীবদের ভালও বাসতুম না, ভয়ও করতুম না,—এক কথায়, ওদের সম্বন্ধে আমি স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলুম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান আমাকে পৃথিবীতে আর যে কাজের জন্যই পাঠান, নায়িকা-সাধন করবার জন্য পাঠান নি। কিন্তু নারীর প্রভাব যে সাধারণ লোকের মনের উপর কত বেশী, কত বিস্তৃত, আর কত স্থায়ী, সে বিষয়ে আমার চোখ কান দুই সমান খোলা ছিল। দুনিয়ার লোকের

এই স্ত্রীলোকের পিছনে পিছনে ছোটাটা আমার কাছে যেমন লজ্জাকর মনে হ'ত, দুনিয়ার কাব্যের নারীপূজাটাও আমার কাছে তেমনি হাস্যকর মনে হ'ত। যে প্রবৃত্তি পশুপক্ষী গাছ-পালা ইত্যাদি প্রাণীমাত্রেরই আছে, সেই প্রবৃত্তিটিকে যদি কবিরা সুরে জড়িয়ে, উপমায় সাজিয়ে, ছন্দে নাচিয়ে, তার মোহিনী শক্তিকে এত বাড়িয়ে না তুলতেন, তাহলে মানুষে তার এত দাস হয়ে পড়ত না। নিজের হাতেগড়া দেবতার পায়ে মানুষে যখন মাথা ঠেকায়, তখন অভক্ত দর্শকের হাসিও পায়, কান্নাও পায়। এই eternal feminineএর উপাসনাই ত মানুষের জীবনকে একটা tragi-comedy করে' তুলেছে। একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারীপূজার মূল, এ কথা অবশ্য তোমরা কখনও স্বীকার করনি। তোমাদের মতে, যে জ্ঞান পশুপক্ষী গাছপালার ভিতর নেই, শুধু মানুষের মনে আছে,—অর্থাৎ সৌন্দর্য্যজ্ঞান,—তাই হচ্ছে এ পূজার যথার্থ মূল। এবং জ্ঞান জিনিষটে অবশ্য মনের ধর্ম্ম, শরীরের নয়। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে কখনও একমত হতে পারিনি, তার কারণ রূপ সম্বন্ধে হয় আমি অন্ধ ছিলুম, নয় তোমরা অন্ধ ছিলে।

আমার ধারণা, প্রকৃতির হাতে-গড়া, কি জড় কি প্রাণী, কোন পদার্থেরই যথার্থ রূপ নেই। প্রকৃতি যে কত বড় কারিকর, তার স্বষ্টি এই ব্রহ্মাণ্ড থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, এমন কি উল্কা পর্য্যন্ত, সব এক ছাঁচে ঢালা, সব গোলাকার,—তাও আবার পুরোপুরি গোল নয়, সবই ঈষৎ তেড়া-বাঁকা, এখানে ওখানে চাপা ও চেপ্টা। এ পৃথিবীতে, যা-কিছু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তা মানুষের হাতেই গড়ে উঠেছে।

Athensএর Parthenon থেকে আগ্রার তাজমহল পর্য্যন্ত এই সত্যেরই পরিচয় দেয়। কবিরা বলে' থাকেন যে, বিধাতা তাঁদের প্রিয়াদের নিজ্জনে বসে' নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু বিধাতা-কর্ত্তৃক এই নিজ্জনে-নির্ম্মিত কোন প্রিয়াই রূপে গ্রীক্‌শিল্পীর বাটালিতে-কাটা পাষাণ-মূর্ত্তির সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। তোমাদের চাইতে আমার রূপজ্ঞান ঢের বেশী ছিল বলে', কোনও মর্ত্ত্য নারীর রূপ দেখে আমার অন্তরে কখনও হৃদরোগ জন্মায় নি। এ স্বভাব, এ বুদ্ধি নিয়েও আমি জীবনের পথে eternal feminineকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি নি। আমি তাঁকে খুঁজি নি,—একেও নয়, অনেকেও নয়,—কিন্তু তিনি আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন। তাঁর হাতে আমার এই শিক্ষা হয়েছে যে, স্ত্রীপুরুষের এই ভালবাসার পুরো অর্থ মানুষের দেহের ভিতরও পাওয়া যায় না, মনের ভিতরও পাওয়া যায় না। কেননা ওর মূলে যা আছে তা হচ্ছে একটি বিরাট রহস্য,—ও পদের সংস্কৃত অর্থেও বটে, বাঙ্গলা অর্থেও বটে—অর্থাৎ ভালবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke.

একবার লণ্ডনে আমি মাসখানেক ধরে' ভয়ানক অনিদ্রায় ভুগছিলুম। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন Ilfracombe যেতে। শুনলুম ইংলণ্ডের পশ্চিম সমুদ্রের হাওয়া লোকের চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দেয়, চুলের ভিতর বিলিকেটে দেয়; সে হাওয়ার স্পর্শে জেগে থাকাই কঠিন—ঘুমিয়ে পড়া সহজ। আমি সেই দিনই Ilfracombe যাত্রা করলুম। এই যাত্রাই আমাকে জীবনের একটি অজানা দেশে পৌঁছে দিলে।

আমি যে হোটেলে গিয়ে উঠি, সেটি Ilfracombeএর সব চাইতে বড়, সব চাইতে সৌখীন হোটেল। সাহেব মেমের ভিড়ে

সেখানে নড়বার জায়গা ছিল না, পা বাড়ালেই কারও না কারও পা মাড়িয়ে দিতে হ'ত। এ অবস্থায় আমি দিনটে বাইরেই কাটাতুম,—তাতে আমার কোন দুঃখ ছিল না, কেননা তখন বসন্তকাল। প্রাণের স্পর্শে জড়জগৎ যেন হঠাৎ শিহরিত পুলকিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। এই সঞ্জীবিত সন্দীপিত প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের কোন সীমা ছিল না। মাথার উপরে সোনার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখ্‌মলের গালিচা, চোখের সুমুখে হীরেকষের সমুদ্র, আর ডাইনে বাঁয়ে শুধু ফুলের জহরৎ-খচিত গাছপালা,—সে পুষ্পরত্নের কোনটি বা সাদা, কোনটি বা লাল,কোনটি বা গোলাপী,কোনটি বা বেগুনি। বিলেতে দেখেছ বসন্তের রং, শুধু জল-স্থল-আকাশের নয়, বাতাসের গায়েও ধরে। প্রকৃতির রূপে অঙ্গসৌষ্ঠবের, রেখার-সুষমার যে অভাব আছে, তা সে এই রঙের বাহারে পুষিয়ে নেয়। এই খোলা আকাশের মধ্যে এই রঙীন প্রকৃতির সঙ্গে আমি দুদিনেই ভাব করে' নিলুম। তার সঙ্গই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য কোন মানব সঙ্গীর অভাব বোধ করিনি। তিন চার দিন বোধহয় আমি কোন মানুষের সঙ্গে একটি কথাও কইনি, কেননা সেখানে আমি জনপ্রাণীকেও চিনতুম না, আর কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে' আলাপ করা আমার ধাতে ছিল না।

তারপর একদিন রাত্রিরে ডিনার খেতে যাচ্ছি, এমন সময় বারাণ্ডায় কে একজন আমাকে Good-evening বলে' সম্বোধন করলে। আমি তাকিয়ে দেখি সুমুখে একটী ভদ্রমহিলা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়েস পঞ্চাশের কম নয়, তার উপর তিনি যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। সেই সঙ্গে নজরে পড়ল যে, তাঁর পরণে চক্‌চকে কালো সাটিনের পোষাক, আর আঙ্গুলে রঙ-

বেরঙের নানা আকারের পাথরের আংটি। বুঝলুম যে এঁর আর যে-বস্তুরই অভাব থাক, পয়সার অভাব নেই। ছোটলোকী বড়মানুষীর এমন চোখে-আঙ্গুল-দেওয়া চেহারা বিলেতে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি দু'কথায় আমার পরিচয় নিয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে ডিনার খেতে অনুরোধ করলেন, আমি ভদ্রতার খাতিরে স্বীকৃত হলুম।

আমরা খানা-কামরায় ঢুকে সবে টেবিলে বসেছি, এমন সময়ে একটি যুবতী গজেন্দ্রগমনে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম, কেননা হাতে-বহরে স্ত্রীজাতির এহেন নমুনা সে দেশেও অতি বিরল। মাথায় তিনি সাহেবের সমান উঁচু, শুধু বর্ণে সাহেব যেমন শ্যাম, তিনি তেমনি শ্বেত, সে সাদার ভিতরে অন্য কোন রঙের চিহ্নও ছিল না, না গালে, না ঠোঁটে, না চুলে, না ভুরুতে। তাঁর পরণের সাদা কাপড়ের সঙ্গে তাঁর চামড়ার কোন তফাৎ করবার জো ছিল না। এই চুনকাম-করা মূর্তিটির গলায় যে একটি মোটা সোনার শিকলি-হার আর দু'হাতে তদনুরূপ chain-bracelet ছিল, আমার চোখ ঈষৎ ইতস্ততঃ করে' তার উপরে গিয়েই বসে' পড়ল। মনে হল যেন ব্রহ্ম-দেশের কোন রাজ-অন্তঃপুর থেকে একটি শ্বেত হস্তিনী তার স্বর্ণ শৃঙ্খল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে! আমি এই ব্যাপার দেখে এতটা ভেবড়ে গিয়েছিলুম যে, তাঁর অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠতে ভুলে গিয়ে, যেমন বসেছিলুম তেমনি বসে রইলুম। কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে থাকতে হল না। আমার নবপরিচিত প্রৌঢ় সঙ্গিনীটি চেয়ার ছেড়ে উঠে, সেই রক্তমাংসের মনুমেন্টের সঙ্গে এই বলে' আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—

"আমার কন্যা Miss Hildesheimer—মিষ্টার—?'

"সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়"

"মিষ্টার গ্যাঁগো—গ্যাঁগো—গ্যাঁগো—"

আমার নামের উচ্চারণ ওর চাইতে আর বেশী এগলো না। আমি শ্রীমতীর করমর্দ্দন করে' বসে' পড়লুম। এক তাল "জেলির" উপর হাত পড়লে গা যেমন করে' ওঠে, আমার তেমনি করতে লাগল। তারপর ম্যাডাম্ আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেন, মিস্ চুপ করেই রইলেন। তাঁর কথা বন্ধ ছিল বলে' যে তাঁর মুখ বন্ধ ছিল, অবশ্য তা নয়। চর্ব্বণ চোষণ লেহন পান প্রভৃতি দন্ত ওষ্ঠ রসনা কণ্ঠ তালুর আসল কাজ সব সজোরেই চলছিল। মাছ মাংস, ফল মিষ্টান্ন, সব জিনিষেই দেখি তাঁর সমান রুচি। যে বিষয়ে আলাপ সুরু হল তাতে যোগদান করবার, আশা করি, তাঁর অধিকার ছিল না।

এই অবসরে আমি যুবতীটিকে একবার ভাল করে' দেখে নিলুম। তার মত বড় চোখ ইউরোপে লাখে একটি স্ত্রীলোকের মুখে দেখা যায় না—সে চোখ যেমন বড়, তেমনি জলো, যেমন নিশ্চল, তেমনি নিস্তেজ। এ চোখ দেখলে সীতেশ ভালবাসায় পড়ে' যেত, আর সেন কবিতা লিখতে বসত। তোমাদের ভাষায় এ নয়ন বিশাল, তরল, করুণ, প্রশান্ত। তোমরা এরকম চোখে মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি কত কি মনের ভাব দেখতে পাও—কিন্তু তাতে আমি যা দেখতে পাই, সে হচ্ছে পোষা জানোয়ারের ভাব; গরু ছাগল ভেড়া প্রভৃতির সব ঐ জাতের চোখ,—তাতে অন্তরের দীপ্তিও নেই, প্রাণের স্ফূর্ত্তিও নেই। এঁর পাশে বসে' আমার সমস্ত শরীরের ভিতরে যে অসোয়াস্তি করছিল, তার মা'র কথা

শুনে আমার মনের ভিতর তার চাইতেও বেশী অসোয়াস্তি কর্‌তে লাগল। জান তিনি আমাকে কেন পাকড়াও করে-ছিলেন?—সংস্কৃত শাস্ত্র ও বেদান্ত-দর্শন আলোচনা করবার জন্য! আমার অপরাধের মধ্যে, আমি যে সংস্কৃত খুব কম জানি, আর বেদান্তের বে দূরে থাক্, আলেফ পর্য্যন্ত জানি নে,—এ কথা একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলুম। ফলে তিনি যখন আমাকে জেরা করতে সুরু কর্‌লেন, তখন আমি মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করলুম। "শ্বেতাশ্বতর" উপনিষদ্ শ্রুতি কি না, গীতার "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" ও বৌদ্ধ নির্ব্বাণ এ দুই এক জিনিষ কি না,—এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি নিতান্তই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম। এ সব বিষয়ে আমাদের পণ্ডিত-সমাজে যে গুরু এবং বিষম মতভেদ আছে, আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার সেই কথাটাই বলছিলুম। আমি যে কি মুস্কিলে পড়েছি, তা আমার প্রশ্নকর্ত্রী বুঝুন আর নাই বুঝুন, আমি দেখতে পাচ্ছিলুম যে আমার পাশের টেবিলের একটি রমণী তা বিলক্ষণ বুঝছিলেন।

সে টেবিলে এই স্ত্রীলোকটি একটি জাঁদরেলি-চেহারার পুরুষের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলেন। সে ভদ্রলোকের মুখের রং এত লাল যে, দেখলে মনে হয় কে যেন তার সদ্য ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে। পুরুষটি যা বলছিলেন, সে সব কথা তার গোঁফেই আট্‌কে যাচ্ছিল, আমাদের কানে পৌঁছচ্ছিল না। তার সঙ্গিনীও তা কানে তুলছিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেননা, স্ত্রীলোকটি যদিচ আমাদের দিকে একবারও মুখ ফেরান্ নি, তবু তাঁর মুখের ভাব থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি আমাদের কথাই কান পেতে শুনছিলেন। যখন আমি কোন

প্রশ্ন শুনে, কি উত্তর দেব ভাবছি, তখন দেখি তিনি আহার বন্ধ করে' তাঁর সুমুখের প্লেটের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রয়েছেন,—আর যেই আমি একটু গুছিয়ে উত্তর দিচ্ছি, তখনি দেখি তাঁর চোখের কোণে একটু সকৌতুক হাসি দেখা দিচ্ছে। আসলে আমাদের এই আলোচনা শুনে তাঁর খুব মজা লাগছিল! কিন্তু আমি শুধু ভাবছিলুম এই ডিনার-ভোগরূপ কর্ম্মভোগ থেকে কখন উদ্ধার পাব! অতঃপর যখন টেবিল ছেড়ে সকলেই উঠলেন, সেই সঙ্গে আমিও উঠে পালাবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে এই বিলাতি ব্রহ্মবাদিনী গার্গী আমাকে বল্লেন—"তোমার সঙ্গে হিন্দুদর্শনের আলোচনা করে' আমি এত আনন্দ আর এত শিক্ষালাভ করেছি যে, তোমাকে আর আমি ছাড়ছিনে। জান, উপনিষদই হচ্ছে আমার মনের ঔষধ ও পথ্য।" আমি মনে মনে বল্লুম—"তোমার যে কোন ওষুধ পথ্যির দরকার, আছে, তা ত তোমার চেহারা দেখে মনে হয় না! সে যাই হোক, তোমার যত খুসি তুমি তত জর্ম্মণীর ল্যাবরিটেরিতে তৈরি বেদান্ত-ভস্ম সেবন কর, কিন্তু আমাকে যে কেন তার অনুপান যোগাতে হবে, তা বুঝতে পারছিনে!" তাঁর মুখ চলতেই লাগল। তিনি বল্লেন—"আমি জর্ম্মণীতে Deussen এর কাছে বেদান্ত পড়েছি, কিন্তু তুমি যত পণ্ডিতের নাম জান ও যত বিভিন্ন মতের সন্ধান জান, আমার গুরু তার সিকির সিকিও জানেন না। বেদান্ত পড়া ত চিন্তা-রাজ্যের হিমালয়ে চড়া, শঙ্কর ত জ্ঞানের গৌরীশঙ্কর! সেখানে কি শান্তি, কি শৈত্য, কি শুভ্রতা, কি উচ্চতা,—মনে করতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়। হিন্দুদর্শন যে যেমন উচ্চ তেমনি বিস্তৃত, এ কথা আমি জানতুম না। চল তোমার কাছ থেকে আমি

এই সব অচেনা পণ্ডিত আর অজানা বইয়ের নাম লিখে নেব।”

এ কথা শুনে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হল, কেননা শাস্ত্রে বলে, মিথ্যে কথা—“শতং বদ মা লিখ”! বলা বাহুল্য যে আমি যত বইয়ের নাম করি তার একটিও নেই, আর যত পণ্ডিতের নাম করি তাঁরা সবাই সশরীরে বর্ত্তমান থাকলেও, তার একজনও শাস্ত্রী নন। আমার পরিচিত যত গুরু, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, কুলজ্ঞ, আচার্য্য, অগ্রদানী—এমন কি রাঁধুনে-বামন পর্য্যন্ত—আমার প্রসাদে সব মহামহোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন। এ অবস্থায় আমি কি করব না ভেবে পেয়ে, ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে অবস্থিতি করছি, এমন সময় পাশের টেবিল থেকে সেই স্ত্রীলোকটি উঠে, এক মুখ হাসি নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন—“বা! তুমি এখানে? ভাল আছ ত? অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। চল আমার সঙ্গে ড্রয়িং-রুমে, তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে।”

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার পদানুসরণ করলুম। প্রথমেই আমার চোখে পড়ল যে, এই রমণীটির শরীরের গড়ন ও চলবার ভঙ্গীতে, শীকারি-চিতার মত একটা লিকলিকে ভাব আছে। ইতিমধ্যে আড় চোখে একবার দেখে নিলুম যে, গার্গী এবং তাঁর কন্যা হাঁ করে’ আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন, যেন তাঁদের মুখের গ্রাস কে কেড়ে নিয়েছে—এবং সে এত ক্ষিপ্রহস্তে যে তাঁরা মুখ বন্ধ করবারও অবসর পান নি!

ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করবামাত্র, আমার এই বিপদ-তারিণী আমার দিকে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে বল্লেন, “ঘণ্টাখানেক ধরে’ তোমার উপর যে উৎপীড়ন হচ্ছিল আমার আর তা সহ্য হল না,

তাই তোমাকে ঐ জর্ম্মণ পশু দুটির হাত থেকে উদ্ধার করে' নিয়ে এসেছি। তোমার যে কি বিপদ কেটে গেছে, তা তুমি জান না। মা'র দর্শনের পালা শেষ হলেই, মেয়ের কবিত্বের পালা আরম্ভ হত। তুমি ওই সব নেক্ড়ার পুতুলদের চেনো না। ওই সব স্ত্রীরত্নদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তেন প্রকারেন পুরুষের গললগ্ন হওয়া। পুরুষমানুষ দেখলে ওদের মুখে জল আসে, চোখে তেল আসে,—বিশেষতঃ সে যদি দেখ্‌তে সুন্দর হয়।"

আমি বল্লুম—"অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি শেষে যে বিপদের কথা বল্‌লে, এ ক্ষেত্রে তার কোনও আশঙ্কা ছিলনা।"

—কেন?

—শুধু ও জাতি নয়, আমি সমগ্র স্ত্রীজাতির হাতের বাইরে।

—তোমার বয়স কত?

—চব্বিশ।

—তুমি বলতে চাও যে, আজ পর্য্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক তোমার চোখে পড়ে নি, তোমার মনে ধরে নি?

—তাই।

—মিথ্যে কথা বলাটা যে তুমি একটা আর্ট করে' তুলেছ, তার প্রমাণ ত এতক্ষণ ধরে পেয়েছি।

—সে বিপদে পড়ে'।

—তবে এই সত্যি যে, একদিনের জন্যেও কেউ তোমার নয়ন মন আক্রমণ করতে পারে নি?

—হাঁ, এই সত্যি। কেননা, সে নয়ন, সে মন একজন চির-দিনের জন্য মুগ্ধ করে রেখেছে।

—সুন্দরী?

—জগতে তার আর তুলনা নেই।

—তোমার চোখে ?

—না, যার চোখ আছে, তারই চোখে।

—তুমি তাকে ভালবাসো ?

—বাসি।

—সে তোমাকে ভালবাসে ?

—না।

—কি করে' জানলে ?

—তার ভালবাসবার ক্ষমতা নেই।

—কেন ?

—তার হৃদয় নেই।

—এ সত্ত্বেও তুমি তাকে ভালবাসো ?

—"এ সত্ত্বেও" নয়, এই জন্যেই আমি তাকে ভালবাসি। অন্যের ভালবাসাটা একটা উপদ্রব বিশেষ—

—তার নাম ধাম জানতে পারি ?

—অবশ্য। তার ধাম প্যারিস, আর নাম Venus de Milo.

এই উত্তর শুনে আমার নবসখী মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে রইল, তার পরেই হেসে বল্লে,

—তোমাকে কথা কইতে কে শিখিয়েছে ?

—আমার মন।

—এ মন কোথা থেকে পেলে ?

—জন্ম থেকে।

—এবং তোমার বিশ্বাস, এ মনের আর কোনও বদল হবে না ?

—এ বিশ্বাস ত্যাগ কর্‌বার আজ পর্য্যন্ত ত কোনও কারণ ঘটে নি।

—যদি Venus de Milo বেঁচে ওঠে?

—তাহলে আমার মোহ ভেঙ্গে যাবে।

—আর আমাদের কারও ভিতরটা যদি পাথর হয়ে যায়?

এ কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে একবার ভাল করে' চেয়ে দেখলুম। আমার statue-দেখা চোখ তাতে পীড়িত বা ব্যথিত হল না। আমি তার মুখ থেকে আমার চোখ তুলে নিয়ে উত্তর করলুম—

—তাহলে হয়ত তার পূজা করব।

—পূজা নয়, দাসত্ব?

—আচ্ছা তাই।

—আগে যদি জানতুম যে তুমি এত বাজেও বকতে পার, তাহলে আমি তোমাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতুম না। যার জীবনের কোনও জ্ঞান নেই, তার দর্শন বকাই উচিত। এখন এস, মুখ বন্ধ করে, আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলেটির মত বসে দাবা খেল।

এ প্রস্তাব শুনে আমি একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে সে বল্‌লে—

"আমি যে পথের মধ্যে থেকে তোমাকে লুফে নিয়ে এসেছি, সে মোটেই তোমার উপকারের জন্য নয়। ওর ভিতর আমার স্বার্থ আছে। দাবা খেলা হচ্ছে আমার বাতিক। ও যখন তোমার দেশের খেলা, তখন তুমি নিশ্চয়ই ভাল খেলতে জান, এই মনে করে তোমাকে গ্রেপ্তার করে আনবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।"

আমি উত্তর করলুম—

"এর পরেই হয়ত আর একজন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলবে 'এস আমাকে ভানুমতীর বাজি দেখাও, তুমি যখন ভারতবর্ষের লোক তখন অবশ্য যাদু জান'।"

সে এ কথার উত্তরে একটু হেসে বল্লে,—

"তুমি এমন কিছু লোভনীয় বস্তু নও যে তোমাকে হস্তগত করবার জন্য হোটেল-সুদ্ধ স্ত্রীলোক উতলা হয়ে উঠেছে! সে যাই হোক, আমার হাত থেকে তোমাকে যে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সে ভয় তোমার পাবার দরকার নেই। আর যদি তুমি যাদু জান তাহলে ভয় ত আমাদেরি পাবার কথা।"

একবার হিন্দুদর্শন জানি বলে বিষম বিপদে পড়েছিলুম, তাই এবার স্পষ্ট করে বল্লুম—

"দাবা খেলতে আমি জানিনে।"

"শুধু দাবা কেন?—দেখছি পৃথিবীর অনেক খেলাই তুমি জান না। আমি যখন তোমাকে হাতে নিয়েছি, তখন আমি তোমাকে ও-সব শেখাব ও খেলাব।"

এর পর আমরা দুজনে দাবা নিয়ে বসে গেলুম। আমার শিক্ষয়িত্রী কোন বলের কি নাম, কার কি চাল, এ সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিতে সুরু করলেন। আমি অবশ্য সে সবই জানতুম, তবু অজ্ঞতার ভাণ করছিলুম, কেননা এঁর সঙ্গে কথা কইতে আমার মন্দ লাগছিল না। আমি ইতিপূর্বে এমন একটি রমণীও দেখিনি, যিনি পুরুষমানুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কইতে পারেন, যাঁর সকল কথা সকল ব্যবহারের

ভিতর কতকটা কৃত্রিমতার আবরণ না থাকে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক--সে যে দেশেরই হো'ক—আমাদের জাতের সুমুখে মন বে-আব্রু করতে পারে না। এই আমি প্রথম স্ত্রীলোক দেখলুম, যে পুরুষ-বন্ধুর মত সহজ ও খোলাখুলি ভাবে কথা কইতে পারে। এর সঙ্গে যে পর্দ্দার আড়াল থেকে আলাপ করতে হচ্ছে না, এতেই আমি খুসি হয়েছিলুম। সুতরাং এই শিক্ষা ব্যাপারটি একটু লম্বা হওয়াতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না।

মাথা নীচু করে অনর্গল বকে গেলেও, আমার সঙ্গিনীটি যে ক্রমান্বয়ে বারান্দার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করছিল, তা আমার নজর এড়িয়ে যায় নি। আমি সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে, তার ডিনারের সাথীটি ঘন ঘন পায়চারি করছেন—এবং তাঁর মুখে জ্বলছে চুরোট, আর চোখে রাগ। আমার বন্ধুটিও যে তা লক্ষ্য করছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই,—কেননা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, ঐ ভদ্রলোকটি তার মনের উপর একটি চাপের মত বিরাজ করছেন। সকল বলের গতিবিধির পরিচয় দিতে তার বোধহয় আধ ঘণ্টা লেগেছিল। তারপরে খেলা সুরু হল। পাঁচ মিনিট না যেতেই বুঝলুম যে, দাবার বিদ্যে আমাদের দুজনেরি সমান,—এক বাজি উঠতে রাত কেটে যাবে। প্রতি চাল দেবার আগে যদি পাঁচ মিনিট করে ভাবতে হয়, তারপর আবার চাল ফিরিয়ে নিতে হয়, তাহলে খেলা যে কতটা এগোয় তা ত বুঝতেই পার। সে যাই হোক, ঘণ্টা আধেক বাদে সেই জাঁদরেলি-চেহারার সাহেবটি হঠাৎ ঘরে ঢুকে, আমাদের খেলার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে, অতি বিরক্তির স্বরে আমার খেলার সাথীকে সম্বোধন করে বল্লেন—

"তাহলে আমি এখন চল্লুম"!

সে কথা শুনে স্ত্রীলোকটি দাবার ছকের দিকে চেয়ে, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর করলেন—"এত শীগ্‌গির" ?

—শীগ্‌গির কিরকম ? রাত এগারটা বেজে গেছে।

—তাই নাকি ? তবে যাও, আর দেরী করো না—তোমাকে ছ'মাইল ঘোড়ায় যেতে হবে।

—কাল আসছ ?

—অবশ্য। সে ত কথাই আছে। বেলা দশটার ভিতর গিয়ে পৌছব।

—কথা ঠিক রাখবে ত ?

—আমি বাইবেল হাতে করে তোমার কথার জবাব দিতে পারি নে !

—Good-night.

—Good-night.

পুরুষটি চলে গেলেন, আবার কি মনে করে ফিরে এলেন। একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"কবে থেকে তুমি দাবা খেলার এত ভক্ত হলে ?" উত্তর এল "আজ থেকে।" এর পরে সেই সাহেবপুঙ্গবটি "হুঁ" এইমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে ঘর থেকে হন্‌ হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন।

আমার সঙ্গিনী অমনি দাবার ঘরটি উল্টে ফেলে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠলেন। মনে হল পিয়ানোর সব চাইতে উঁচু সপ্তকের উপর কে যেন অতি হাল্‌কাভাবে আঙ্গুল বুলিয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার ভিতর থেকে যেন একটি প্রাণের ফোয়ারা উছলে পড়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেল। দেখতে দেখতে বাতির আলো সব হেসে উঠল। ফুলদানের কাটা-ফুল সব টাট্‌কা

হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে আমার মনের যন্ত্রও এক সুর চড়ে গেল।

—তোমার সঙ্গে দাবা খেলবার অর্থ এখন বুঝলে?

—না।

—ঐ ব্যক্তির হাত এড়াবার জন্য। নইলে আমি দাবা খেলতে বসি? ওর মত নির্বুদ্ধির খেলা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। George এর মত লোকের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যে একত্র থাকলে শরীর মন একদম ঝিমিয়ে পড়ে। ওদের কথা শোনা আর আফিং খাওয়া, একই কথা।

—কেন?

—ওদের সব বিষয়ে মত আছে, অথচ কোনও বিষয়ে মন নেই। ও জাতের লোকের ভিতরে সার আছে, কিন্তু রস নেই। ওরা স্ত্রীলোকের স্বামী হবার যেমন উপযুক্ত, সঙ্গী হবার তেমনি অনুপযুক্ত।

—কথাটা ঠিক বুঝলুম না। স্বামীই ত স্ত্রীর চিরদিনের সঙ্গী।

—চিরদিনের হলেও একদিনেরও নয়—এমন হতে পারে, এবং হয়েও থাকে।

—তবে কি গুণে তারা স্বামী হিসেবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে?

—ওদের শরীর ও চরিত্র দুয়েরই ভিতর এতটা জোর আছে যে, ওরা জীবনের ভার অবলীলাক্রমে বহন করতে পারে। ওদের প্রকৃতি ঠিক তোমাদের উল্টো। ওরা ভাবে না—কাজ করে। এক কথায়—ওরা হচ্ছে সমাজের স্তম্ভ, তোমাদের মত ঘর সাজাবার ছবি কি পুতুল নয়।

—হতে পারে এক দলের লোকের বাইরেটা পাথর আর ভিতরটা শিশে দিয়ে গড়া, আর তারাই হচ্ছে আসল মানুষ,—কিন্তু তুমি এই দুদণ্ডের পরিচয়ে আমার স্বভাব চিনে নিয়েছ?

—অবশ্য! আমার চোখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ ত, দেখতে পাবে যে তার ভিতর এমন একটি আলো আছে, যাতে মানুষের ভিতর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

আমি নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, সে চোখ দুটি "লউসনিয়া" দিয়ে গড়া। লউসনিয়া কি পদার্থ জান? একরকম রত্ন—ইংরাজীতে যাকে বলে cats-eye—তার উপর আলোর "সূত" পড়ে, আর প্রতিমুহূর্ত্তে তার রং বদলে যায়।—আমি একটু পরেই চোখ ফিরিয়ে নিলুম, ভয় হল সে আলো পাছে সত্যি সত্যিই আমার চোখের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতর প্রবেশ করে।

—এখন বিশ্বাস করছ যে আমার দৃষ্টি মর্ম্মভেদী?

—বিশ্বাস করি আর না করি, স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই।

—শুনতে চাও তোমার সঙ্গে George-এর আসল তফাৎটা কোথায়?

—পরের মনের আয়নায় নিজের মনের ছবি কিরকম দেখায়, তা বোধহয় মানুষমাত্রেই জানতে চায়।

—একটি উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। George হচ্ছে দাবার নৌকা, আর তুমি গজ। ও একরোখে সিধে পথেই চলতে চায়, আর তুমি কোণাকুণি।

—এ দুয়ের মধ্যে কোনটি তোমাদের হাতে খেলে ভাল?

—আমাদের কাছে ও-দুইই সমান। আমরা স্কন্ধে ভর করলে দুয়েরই চাল বদলে যায়। উভয়েই এঁকে বেঁকে আড়াই পায়ে চলতে বাধ্য হয়!

—পুরুষমানুষকে ওরকম ব্যতিব্যস্ত করে তোমরা কি সুখ পাও?

এ কথা শুনে সে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বল্লে—

"তুমি ত আমার Father Confessor নও যে মন খুলে তোমার কাছে আমার সব সুখদুঃখের কথা বলতে হবে! তুমি যদি আমাকে ও-ভাবে জেরা করতে সুরু কর, তাহলে এখনই আমি উঠে চলে যাব।"

এই বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে। আমার রূঢ় কথা শোনা অভ্যাস ছিল না, তাই আমি অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করলুম—

"তুমি যদি চলে যেতে চাও ত আমি তোমাকে থাকতে অনুরোধ করব না। ভুলে যেও না যে আমি তোমাকে ধরে রাখি নি।"—এ কথার পর মিনিটখানেক চুপ করে থেকে, সে অতি বিনীত ও নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে—

"আমার উপর রাগ করেচ?"

আমি একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করলুম—

"না। রাগ করবার ত কোনও কারণ নেই।"

—তবে অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

—"এতক্ষণ এই বন্ধ ঘরে গ্যাসের বাতির নীচে বসে বসে আমার মাথা ধরেচে"—এই মিথ্যে কথা আমার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে গেল। এর উত্তরে "দেখি তোমার জ্বর হয়েছে কি না" এই কথা বলে সে আমার কপালে হাত দিলে। সে স্পর্শের ভিতর তার আঙ্গুলের ডগার একটু সসঙ্কোচ আদরের

ইসারা ছিল। মিনিটখানেক পরে সে তার হাত তুলে নিয়ে বল্লে—"তোমার মাথা একটু গরম হয়েছে, কিন্তু ও জ্বর নয়। চল বাইরে গিয়ে বসবে, তাহলেই ভাল হয়ে যাবে।"—

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার পদানুসরণ করলুম। তোমরা যদি বল যে সে আমাকে mesmerise করেছিল, তাহলে আমি সে কথার প্রতিবাদ করব না।

বাইরে গিয়ে দেখি সেখানে জনমানব নেই - যদিও রাত তখন সাড়ে এগারটা, তবু সকলে শুতে গিয়েছে। বুঝলুম Ilfracombe সত্য সত্যই ঘুমের রাজ্য। আমরা দুজনে দুখানি বেতের চেয়ারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। দেখি আকাশ আর সমুদ্র দুই এক হয়ে গেছে—দুইই শ্লেটের রং। আর আকাশে যেমন তারা জ্বলছে, সমুদ্রের গায়ে তেমনি যেখানে যেখানে আলো পড়ছে সেখানেই তারা ফুটে উঠছে,—এখানে ওখানে সব জলের টুকরো টাকার মত চকচক করছে, পারার মত টলমল্ করছে। গাছপালার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন স্থানে স্থানে অন্ধকার জমাট হয়ে গিয়েছে। তখন সসাগরা বসুন্ধরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছিল। এই নিস্তব্ধ নিশীথের নিবিড় শান্তি আমার সঙ্গিনীটির হৃদয়মন স্পর্শ করেছিল—কেননা সে কতক্ষণ ধরে ধ্যানমগ্ন ভাবে বসে রইল। আমিও চুপ করে রইলুম। তারপর সে চোখ বুজে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—

"তোমার দেশে যোগী বলে একদল লোক আছে, যারা কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করে না, আর সংসার ত্যাগ করে বনে চলে যায়?"

—বনে যায়, এ কথা সত্য।

—আর সেখানে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে অহর্নিশি জপতপ করে?

—এইরকম ত শুনতে পাই।

—আর তার ফলে যত তাদের দেহের ক্ষয় হয়, তত তাদের মনের শক্তি বাড়ে,—যত তাদের বাইরেটা স্থিরশান্ত হয়ে আসে, তত তাদের অন্তরের তেজ ফুটে ওঠে?

—তা হলেও হতে পারে।

—"হতে পারে" বলছ কেন? শুনেছি তোমরা বিশ্বাস কর যে, এদের দেহমনে এমন অলৌকিক শক্তি জন্মায় যে, এই সব মুক্ত জীবের স্পর্শে এবং কথায় মানুষের শরীরমনের সকল অসুখ সেরে যায়।

—ও সব মেয়েলি বিশ্বাস।

—তোমার নয় কেন?

—আমি যা জানিনে তা বিশ্বাস করিনে। আমি এর সত্যি-মিথ্যে কি করে জানব? আমি ত আর যোগ অভ্যাস করি নি।

—আমি ভেবেছিলুম তুমি করেছ।

—এ অদ্ভুত ধারণা তোমার কিসের থেকে হল?

—ঐ জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের মত তোমার মুখে একটা শীর্ণ, ও চোখে একটা তীক্ষ্ণ ভাব আছে।

—তার কারণ অনিদ্রা।

—আর অনাহার। তোমার চোখে মনের অনিদ্রা ও হৃদয়ের উপবাস,—এ দুয়েরি লক্ষণ আছে। তোমার মুখের ঐ ছাই-চাপা আগুনের চেহারা প্রথমেই আমার চোখে পড়ে। একটা অদ্ভুত কিছু দেখলে মানুষের চোখ সহজেই তার দিকে যায়, তার বিষয় সবিশেষ জানবার জন্য মন লালায়িত

হয়ে ওঠে। Georgeএর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য যে তোমার আশ্রয় নিই, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; তোমাকে একবার নেড়েচেড়ে দেখবার জন্যই আমি তোমার কাছে আসি।

—আমার তপোভঙ্গ করবার জন্য?

—তুমি যেদিন St Anthony হয়ে উঠবে, আমিও সেদিন স্বর্গের অপ্সরা হয়ে দাঁড়াব। ইতিমধ্যে তোমার ঐ গেরুয়া রঙের মিনে-করা মুখের পিছনে কি ধাতু আছে, তাই জানবার জন্য আমার কৌতূহল হয়েছিল।

—কি ধাতু আবিষ্কার করলে শুনতে পারি?

—আমি জানি তুমি কি শুনতে চাও।

—তাহলে তুমি আমার মনের সেই কথা জান, যা আমি জানিনে।

—অবশ্য! তুমি চাও আমি বলি—চুম্বক।

কথাটি শোনবামাত্র আমার জ্ঞান হল যে, এ উত্তর শুনলে আমি খুসি হতুম, যদি তা বিশ্বাস করতুম। এই নব আকাঙ্ক্ষা সে আমার মনের ভিতর আবিষ্কার করলে, কি নির্ম্মাণ করলে, তা আমি আজও জানি নে। আমি মনে মনে উত্তর খুঁজছি, এমন সময়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "কটা বেজেছে?" আমি ঘড়ি দেখে বল্লুম—"বারোটা।"

"বারোটা" শুনে সে লাফিয়ে উঠে বললে—

"উঃ! এত রাত হয়ে গেছে? তুমি মানুষকে এত বকাতেও পার! যাই, শুতে যাই। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে। অনেক দূর যেতে হবে, তাও আবার দশটার ভিতর পৌঁছাতে হবে।"

—কোথায় যেতে হবে?

—একটা শীকারে। কেন, তুমি কি জান না? তোমার সুমুখেইত Georgeএর সঙ্গে কথা হল।

—তাহলে সে কথা তুমি রাখ্‌বে?

—তোমার কিসে মনে হল যে রাখ্‌ব না?

—তুমি যে ভাবে তার উত্তর দিলে।

—সে শুধু Georgeকে একটু নিগ্রহ করবার জন্য। আজ রাত্তিরে ওর ঘুম হবে না, আর জানইত ওদের পক্ষে জেগে থাকা কত কষ্ট!

—তোমার দেখছি বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অনুগ্রহ অতি বেশী।

—অবশ্য। George-এর মত পুরুষমানুষের মনকে মাঝে মাঝে একটু উস্‌কে না দিলে তা সহজেই নিভে যায়। আর তা ছাড়া ওদের মনে খোঁচা মারার ভিতর বেশী কিছু নিষ্ঠুরতাও নেই। ওদের মনে কেউ বেশী কষ্ট দিতে পারে না, ওরাও এক প্রহার দেওয়া ছাড়া স্ত্রীলোককে অন্য কোনও কষ্ট দিতে পারে না। সেই জন্যইত ওরা আদর্শ স্বামী হয়। মন নিয়ে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি, সে তোমার মত লোকেই করে।

—তোমার কথা আমার হেঁয়ালির মত লাগছে—

—যদি হেঁয়ালি হয় ত তাই হোক্। তোমার জন্যে আমি আর তার ব্যাখ্যা করতে পারি নে। আমার যেমন শ্রান্ত মনে হচ্চে, তেমনি ঘুম পাচ্চে। তোমার ঘর উপরে?

—হাঁ।

—তবে এখন ওঠ, উপরে যাওয়া যাক্।

আমরা দুজনে আবার ঘরে ফিরে এলুম।

করিডোরে পৌঁছবামাত্র সে বল্লে—"ভাল কথা, তোমার একখানা কার্ড আমাকে দেও"—

আমি কার্ডখানি দিলুম। সে আমার নাম পড়ে বল্লে—"তোমাকে আমি 'সু' বলে ডাকব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব ?"

উত্তর—যা-খুসি-একটা-কিছু বানিয়ে নেও না। ভাল কথা, আজ তোমাকে যে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি, তাতে তোমার আমাকে saviour বলে ডাকা উচিত।

—তথাস্তু।

—তোমার ভাষায় ওর নাম কি ?

—আমার দেশে বিপন্নকে যিনি উদ্ধার করেন, তিনি দেব নন—দেবী,—তাঁর নাম "তারিণী।"

"বাঃ, দিব্যি নাম ত ! ওর তা-টি বাদ দিয়ে আমাকে "রিণী" বলে ডেকো।" এই কথাবার্ত্তা কইতে কইতে আমরা সিঁড়িতে উঠছিলুম। একটা গ্যাসের বাতির কাছে আসবামাত্র সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে, আমার হাতের দিকে চেয়ে বল্লে, "দেখি দেখি তোমার হাতে কি হয়েছে ?" অমনি নিজের হাতের দিকে আমার চোখ পড়্‌ল, দেখি হাতটি লাল টক্‌ টক্‌ করছে, যেন কে তাতে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। সে আমার ডান হাতখানি নিজের বাঁ হাতের উপরে রেখে জিজ্ঞাসা করলে—

"কার বুকের রক্তে হাত ছুপিয়েছ— অবশ্য Venus de Milo'র নয় ?

—না, নিজের।

—এতক্ষণ পরে একটি সত্য কথা বলেছ ! আশা করি এ রং পাকা। কেননা যেদিন এ রং ছুটে যাবে, সেদিন

জেনো তোমার সঙ্গে আমার ভাবও চটে যাবে। যাও, এখন শোওগে। ভাল করে ঘুমিয়ো, আর আমার বিষয় স্বপ্ন দেখো।”—

এই কথা বলে সে ড্'লাকে অন্তর্ধান হল।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে আরসিতে নিজের চেহারা দেখে চমকে গেলুম। এক বোতল শ্যাম্পেন খেলে মানুষের যেরকম চেহারা হয়, আমার ঠিক সেইরকম হয়েছিল। দেখি দুই গালে রক্ত দেখা দিয়েছে, আর চোখের তারা দুটি শুধু জ্বল্ জ্বল্ করছে—বাকী অংশ ছল্ ছল্ করছে। সে সময় আমার নিজের চেহারা আমার চোখে বড় সুন্দর লেগেছিল। আমি অবশ্য তাকে স্বপ্ন দেখি নি,—কেননা, সে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় নি।

(২)

সে রাত্তিরে আমরা দুজনে যে জীবন-নাটকের অভিনয় সুরু করি, বছরখানেক পরে আর এক রাত্তিরে তার শেষ হয়। আমি প্রথম দিনের সব ঘটনা তোমাদের বলেছি, আর শেষ দিনের বলব,—কেননা এ দু'দিনের সকল কথা আমার মনে আজও গাঁথা রয়েছে। তা ছাড়া ইতিমধ্যে যা ঘটেছিল, সে সব আমার মনের ভিতর,—বাইরে নয়। যে ব্যাপারে বাহ্য-ঘটনার বৈচিত্র্য নেই, তার কাহিনী বলা যায় না। আমার মনের সে বৎসরের ডাক্তারি-ডায়রি যখন আমি নিজেই পড়তে ভয় পাই, তখন তোমাদের তা পড়ে শোনাবার আমার তিল মাত্রও অভিপ্রায় নেই।

এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, আমার মনের অদৃশ্য তার-গুলি "রিণী" তার দশ আঙ্গুলে এমনি করে' ধরে', সে-মনকে পুতুল নাচিয়েছিল। আমার অন্তরে সে যে-প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছিল, তাকে ভালবাসা বলে কি না জানি নে; এইমাত্র জানি যে, সে মনোভাবের ভিতর অহঙ্কার ছিল, অভিমান ছিল, রাগ ছিল, জেদ ছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল করুণ মধুর দাস্য ও সখ্য এই চারিটি হৃদয়রস।—এর মধ্যে যা লেশমাত্রও ছিল না, সে হচ্ছে দেহের নাম কি গন্ধ। আমার মনের এই কড়িকোমল পর্দ্দা-গুলির উপর সে তার আঙ্গুল চালিয়ে যখন-যেমন ইচ্ছে তখন-তেমনি সুর বার করতে পারত। তার আঙ্গুলের টিপে সে সুর কখনও বা অতি-কোমল, কখনও বা অতি-তীব্র হত।

একটি ফরাসী কবি বলেছেন যে, রমণী হচ্ছে আমাদের দেহের ছায়া। তাকে ধরতে যাও সে পালিয়ে যাবে, আর তার কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা কর, সে তোমার পিছু পিছু ছুটে আসবে। আমি বারমাস ধরে' এই ছায়ার সঙ্গে অহর্নিশি লুকোচুরি খেলেছিলুম। এ খেলার ভিতর কোনও সুখ ছিল না। অথচ এ খেলা সাঙ্গ করবার শক্তিও আমার ছিল না। অনিদ্রাগ্রস্ত লোক যেমন যত বেশী ঘুমতে চেষ্টা করে, তত বেশী জেগে ওঠে,—আমিও তেমনি যত বেশী এই খেলা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতুম, তত বেশী তাতে জড়িয়ে পড়তুম। সত্য কথা বল্‌তে গেলে, এ খেলা বন্ধ করবার জন্য আমার আগ্রহও ছিল না,—কেন না আমার মনের এই নব অশান্তির মধ্যে নব জীবনের তীব্র স্বাদ ছিল।

আমি যে শত চেষ্টাতেও "রিণী"র মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারি নি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই—কেন না আকাশ

বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদ্‌লাত। আজ ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুৎ,—কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধূলি, আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফূর্ত্তি হত, তার আমোদ চড়্‌ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার করত; আমার নাক ধরে টানত, চুল ধরে টানত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে' দেখাত। আবার কখনও বা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে', যেন আপন মনে, নিজের ছেলেবেলাকার গল্প করে যেত। তাকে কে কবে বকেছে, কে কবে আদর করেছে, সে কবে কি পড়েছে, কবে কি প্রাইজ পেয়েছে, কবে বনভোজন করেছে, কবে ঘোড়া থেকে পড়েছে; যখন সে এই সকলের খুঁটিয়ে বর্ণনা করত, তখন একটি বালিকা-মনের স্পষ্ট ছবি দেখতে পেতুম। সে ছবির রেখাগুলি যেমন সরল, তার বর্ণও তেমনি উজ্জ্বল। তারপর সে ছিল গোঁড়া রোমান-ক্যাথলিক। একটি আব্‌লুশ-কাঠের ক্রুশে-আঁটা রূপোর ক্রাইস্ট তার বুকের উপর অষ্টপ্রহর ঝুল্‌ত, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে তা স্থানান্তরিত করে নি। সে যখন তার ধর্ম্মের বিষয় বক্তৃতা আরম্ভ করত, তখন মনে হত তার বয়েস আশি বৎসর। সে সময়ে তার সরল বিশ্বাসের সুমুখে আমার দার্শনিক বুদ্ধি মাথা হেঁট করে' থাকত। কিন্তু আসলে সে ছিল পূর্ণ যুবতী,—যদি যৌবনের অর্থ হয় প্রাণের উদ্দাম উচ্ছ্বাস। তার সকল মনোভাব, সকল ব্যবহার, সকল কথার ভিতর এমন একটি প্রাণের জোয়ার বইত, যার তোড়ে আমার অন্তরাত্মা অবিশ্রান্ত তোলপাড় করত। আমরা মাসে

দশবার করে' ঝগড়া করতুম, আর ঈশ্বরসাক্ষী করে' প্রতিজ্ঞা করতুম যে, জীবনে আর কখনও পরস্পরের মুখ দেখ্‌ব না। কিন্তু দু'দিন না যেতেই, হয় আমি তার কাছে ছুটে যেতুম, নয় সে আমার কাছে ছুটে আস্‌ত। তখন আমরা আগের কথা সব ভুলে যেতুম—সেই পুনর্মিলন আবার আমাদের প্রথম মিলন হয়ে উঠ্‌ত। এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গিয়েছিল। আমাদের শেষ ঝগড়াটা অনেক দিন স্থায়ী হয়েছিল। আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম যে, সে আমার মনের সর্ব্বপ্রধান দুর্ব্বলতাটি আবিষ্কার করেছিল—তার নাম jealousy!—যে মনের আগুনে মানুষ জ্বলে পুড়ে মরে, "রিণী" সে আগুন জ্বালাবার মন্ত্র জান্‌ত। আমি পৃথিবীতে বহুলোককে অবজ্ঞা করে' এসেছি—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কাউকে কখনও হিংসা করিনি। বিশেষতঃ Georgeএর মত লোককে হিংসা করার চাইতে আমার মত লোকের পক্ষে বেশী কি হীনতা হতে পারে? কারণ, তার যা ছিল, তা হচ্ছে টাকার জোর আর গায়ের জোর। কিন্তু "রিণী" আমাকে এ হীনতাও স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। তার শেষবারের ব্যবহার আমার কাছে যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অপমানজনক মনে হয়েছিল। নিজের মনের দুর্ব্বলতার স্পষ্ট পরিচয় পাবার মত কষ্টকর জিনিষ মানুষের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।

ভয় যেমন মানুষকে দুঃসাহসিক করে' তোলে, আমার ঐ দুর্ব্বলতাই তেমনি আমার মনকে এত শক্ত করে' তুলেছিল যে, আমি আর কখনও তার মুখদর্শন করতুম না—যদি না সে আমাকে চিঠি লিখ্‌ত। সে চিঠির প্রতি অক্ষর আমার মনে আছে,—সে চিঠি এই:—

"তোমার সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয়, তখন দেখেছিলুম যে তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়ছে—আমার মনে হয় তোমার পক্ষে একটা change নিতান্ত আবশ্যক। আমি যেখানে আছি, সেখানকার হাওয়া মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলে। এ জায়গাটা একটি অতি ছোট পল্লীগ্রাম। এখানে তোমার থাকবার মত কোনও স্থান নেই। কিন্তু এর ঠিক পরের ষ্টেসনটীতে অনেক ভাল ভাল হোটেল আছে। আমার ইচ্ছে তুমি কালই লণ্ডন ছেড়ে সেখানে যাও। এখন এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি—আর দেরি করলে এমন চমৎকার সময় আর পাবে না। যদি হাতে টাকা না থাকে, আমাকে টেলিগ্রাম কর', আমি পাঠিয়ে দেব। পরে সুদসুদ্ধ তা শুধে দিয়ো।"

আমি চিঠির কোন উত্তর দিলুম না, কিন্তু পরদিন সকালের ট্রেনেই লণ্ডন ছাড়লুম। আমি কোন কারণে তোমাদের কাছে, সে জায়গার নাম করব না। এই পর্য্যন্ত বলে রাখি, "রিণী" যেখানে ছিল তার নামের প্রথম অক্ষর B, এবং তার পরের ষ্টেসনের নামের প্রথম অক্ষর W.

ট্রেন যখন B ষ্টেসনে গিয়ে পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় দু'টো। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম "রিণী" প্লাটফরমে নেই। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, প্লাটফরমের রেলিংয়ের ওপারে রাস্তার ধারে একটি গাছে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে যে কেন আমি তাকে দেখতে পাই নি, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, কেননা সে যে রঙের কাপড় পরেছিল তা আধক্রোশ দূর থেকে মানুষের চোখে পড়ে—একটি মিসমিসে কালো গাউনের উপর একটি ডগডগে হলদে জ্যাকেট। সেদিনকে 'রিণী' এক অপ্রত্যাশিত

নতুন মূর্ত্তিতে, আমাদের দেশের নববধূর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিল। এই বজ্রবিদ্যুৎ দিয়ে গড়া রমণীর মুখে আমি পূর্ব্বে কখন লজ্জার চিহ্নমাত্রও দেখ্‌তে পাইনি। কিন্তু সেদিন তার মুখে যে হাসি ঈষৎ ফুটে উঠেছিল, সে লজ্জার রক্তিম হাসি। সে চোখ তুলে আমার দিকে ভাল করে চাইতে পারছিল না। তার মুখখানি এত মিষ্টি দেখাচ্ছিল যে, আমি চোখ ভরে প্রাণভরে তাই দেখ্‌তে লাগলুম। আমি যদি কখনও তাকে ভালবেসে থাকি, ত সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে! মানুষের সমস্ত মনটা যে এক মুহূর্ত্তে এমন করে রঙ ধরে উঠতে পারে, এ সত্যের পরিচয় আমি সেই দিন প্রথম পাই।

ট্রেন B ষ্টেসনে বোধ হয় মিনিটখানেকের বেশী থামে নি, কিন্তু সেই এক মিনিট আমার কাছে অনন্তকাল হয়েছিল। তার মিনিট পাঁচেক পরে ট্রেন [illegible] ষ্টেসনে পৌঁছল। আমি সমুদ্রের ধারে একটি বড় হোটেলে গিয়ে উঠলুম। কেন জানিনে, হোটেলে পৌঁছেই আমার অগাধ শ্রান্তি বোধ হতে লাগল। আমি কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। এই একটি মাত্র দিন যখন আমি বিলেতে দিবানিদ্রা দিয়েছি, আর এমন ঘুম আমি জীবনে কখনও ঘুমোই নি। জেগে উঠে দেখি পাঁচটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নীচে এসে চা খেয়ে পদব্রজে B-র অভিমুখে যাত্রা করলুম। যখন সে গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলুম, তখন প্রায় সাতটা বাজে; তখনও আকাশে যথেষ্ট আলো ছিল। বিলেতে জানইত গ্রীষ্মকালের রাত্তির দিনের জের টেনে নিয়ে আসে: সূর্য্য অস্ত গেলেও, তার পশ্চিম আলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত্তিরের গায়ে জড়িয়ে থাকে। "রিণী" কোন্ পাড়ায় কোন্ বাড়ীতে থাকে, তা আমি জানতুম

না, কিন্তু আমি এটা জানতুম যে, W থেকে B যাবার রাস্তায় কোথায়ও না কোথায়ও তার দেখা পাব।

B-র সামাতে পা দেবামাত্রই দেখি, একটি স্ত্রীলোক একটু উতলাভাবে রাস্তায় পায়চারি করছে। দূর থেকে তাকে চিনতে পারিনি, কেননা ইতিমধ্যে "রিণী" তার পোষাক বদলে ফেলেছিল। সে কাপড়ের রংয়ের নাম জানি নে, এই পর্যান্ত বলতে পারি যে সেই সন্ধ্যার আলোর সঙ্গে সে এক হয়ে গিয়েছিল— সে রং যেন গোধূলিতে ছোপানো।

আমাকে দেখবামাত্র "রিণী" আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে সেই দিকে এগতে লাগলুম। আমি জানতুম যে, সে এই গাছপালার ভিতর নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে—সহজে ধরা দেবে না—একটু খুঁজে পেতে তাকে বার করতে হবে। আমি অবশ্য তার এ ব্যবহারে আশ্চর্য্য হয়ে যাইনি, কেননা এতদিনে আমার শিক্ষা হয়েছিল যে, "রিণী" যে কখন কি ব্যবহার করবে, তা অপরের জানা দূরে থাক, সে নিজেই জানত না। আমি একটু এগিয়ে দেখি, ডান দিকে বনের ভিতর একটি গলি রাস্তার ধারে একটি oak গাছের আড়ালে "রিণী" দাঁড়িয়ে আছে, এমন ভাবে যাতে পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরা আলো তার মুখের উপর এসে পড়ে। আমি অতি সন্তর্পণে তার দিকে এগতে লাগলুম, সে চিত্র-পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়েই রইল। তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে, বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণীমূর্ত্তির মত দেখাচ্ছিল,— সে মূর্ত্তি যেমন সুন্দর, তেমনি কঠিন। আমি কাছে যাবামাত্র, সে দু'হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকলে। আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। দুজনের কারও মুখে কথা নেই।

কতক্ষণ এ ভাবে গেল জানিনে। তারপর প্রথমে কথা অবশ্য "রিণীই" কইলে—কেননা সে বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারত না—বিশেষতঃ আমার কাছে। তার কথার স্বরে ঝগড়ার পূর্ব্বাভাস ছিল। প্রথম সম্ভাষণ হল এই :—"তুমি এখান থেকে চলে যাও! আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইনে, তোমার মুখ দেখতে চাইনে"।

—আমার অপরাধ ?

—তুমি এখানে কেন এলে ?

—তুমি আসতে লিখেছ বলে।

—সেদিন আমার বড় মন খারাপ ছিল। বড় একা একা মনে হচ্ছিল বলে ঐ চিঠি লিখি। কিন্তু কখনও মনে করিনি, তুমি চিঠি পাবামাত্র ছুটে এখানে চলে আসবে। তুমি জান যে, মা যদি টের পান যে আমি একটি কালো লোকের সঙ্গে ইয়ারকি দিই, তাহলে আমাকে বাড়ী ছাড়তে হবে ?

ইয়ারকি শব্দটি আমার কাণে খট্ করে লাগল, আমি ঈষৎ বিরক্তভাবে বললুম—"তোমার মুখেই তা শুনেছি। তার সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও তুমি ভাবনি যে আমি আসব ?

—স্বপ্নেও না।

—তাহলে ট্রেন আসবার সময় কার খোঁজে ষ্টেশনে গিয়েছিলে ?

—কারও খোঁজে নয়। চিঠি ডাকে দিতে।

—তাহলে ওরকম কাপড় পরেছিলে কেন, যা আধক্রোশ দূর থেকে কাণা লোকেরও চোখে পড়ে ?

—তোমার সুনজরে পড়্‌বার জন্য।

—সু হোক, কু হোক, আমার নজরেই পড়্‌বার জন্য।

—তোমার বিশ্বাস তোমাকে না দেখে আমি থাক্‌তে পারি নে?

—তা কি করে বল্‌ব! এইত এতক্ষণ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছ।

—সে চোখে আলো সইছে না বলে। আমার চোখে অসুখ করেছে।

"দেখি কি হয়েছে", এই বলে আমি আমার হাত দিয়ে তার মুখ থেকে তার হাত দু'খানি তুলে নেবার চেষ্টা করলুম। "রিণী" বল্লে, "তুমি হাত সরিয়ে নেও, নইলে আমি চোখ খুলব না। আর তুমি জান যে, জোরে তুমি আমার সঙ্গে পার্‌বে না।"

—আমি জানি যে আমি George নই। গায়ের জোরে আমি কারও চোখ খোলাতে পারব না।

এ কথা শুনে "রিণী" মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে, মহা উত্তেজিতভাবে বল্‌লে, "আমার চোখ খোলাবার জন্য কারও ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমিত আর তোমার মত অন্ধ নই! তোমার যদি কারও ভিতরটা দেখ্‌বার শক্তি থাক্‌ত, তাহলে তুমি আমাকে যখন-তখন এত অস্থির করে তুলতে না। জান আমি কেন রাগ করেছিলুম? তোমার ঐ কাপড় দেখে! তোমাকে ও-কাপড়ে আজ দেখব না বলে আমি চোখ বন্ধ করেছিলুম।"

—কেন, এ কাপড়ের কি দোষ হয়েছে? এটি ত আমার সব চাইতে সুন্দর পোষাক।

—দোষ এই যে, এ সে কাপড় নয়, যে কাপড়ে আমি তোমাকে প্রথম দেখি।

এ কথা শোনবামাত্র আমার মনে পড়ে গেল যে, "রিণী" সেই কাপড় পরে আছে, যে কাপড়ে আমি প্রথম তাকে Ilfracombe-য়ে দেখি। আমি ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বল্লুম, "এ কথা আমার মনে হয়নি যে আমরা পুরুষ-মানুষ, কি পরি না পরি তাতে তোমাদের কিছু যায় আসে।"—

—না, আমরা ত আর মানুষ নই, আমাদের ত আর চোখ নেই। তোমার হয়ত বিশ্বাস যে, তোমরা সুন্দর হও, কুৎসিৎ হও, তাতেও আমাদের কিছু যায় আসে না।

—আমার ত তাই বিশ্বাস।

—তবে কিসের টানে তুমি আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াও?

—রূপের?

—অবশ্য! তুমি হয়ত ভাব তোমার কথা শুনে আমি মোহিত হয়েছি। স্বীকার করি তোমার কথা শুনতে আমার অত্যন্ত ভাল লাগে,—শুধু তা নয়, নেশাও ধরে। কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শোনবার আগে যে মুহূর্তে আমি তোমাকে দেখি, সেইক্ষণে আমি বুঝেছিলুম যে, আমার জীবনে একটি নূতন জ্বালার সৃষ্টি হল,—আমি চাই আর না চাই, তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের চিরসংঘর্ষ থেকেই যাবে।

—এ সব কথাত এর আগে তুমি কখন বলনি।

—ও কানে শোনবার কথা নয়, চোখে দেখবার জিনিষ। সাধে কি তোমাকে আমি অন্ধ বলি? এখন শুনলে ত,

এস সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি। আজকে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

যে পথ ধরে চল্লুম সে পথটি যেমন সরু, দু'পাশের বড় বড় গাছের ছায়ায় তেমনি অন্ধকার। আমি পদে পদে হোঁচট্ খেতে লাগলুম। "রিণী" বল্‌লে "আমি পথ চিনি, তুমি আমার হাত ধর, আমি তোমাকে নিরাপদে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে দেব।" আমি তার হাত ধরে নীরবে সেই অন্ধকার পথে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমি অনুমানে বুঝলুম যে, এই নির্জ্জন অন্ধকারের প্রভাব তার মনকে শান্ত, বশীভূত করে আনচে। কিছুক্ষণ পর প্রমাণ পেলুম যে আমার অনুমান ঠিক।

মিনিট দশেক পরে "রিণী" বল্‌লে—"সু, তুমি জানো যে তোমার হাত তোমার মুখের চাইতে ঢের বেশী সত্যবাদী?"

—তার অর্থ?

—তার অর্থ, তুমি মুখে যা চেপে রাখ, তোমার হাতে তা ধরা পড়ে।

—সে বস্তু কি?

—তোমার হৃদয়।

—তারপর?

—তারপর, তোমার রক্তের ভিতর যে বিদ্যুৎ আছে, তোমার আঙ্গুলের মুখ দিয়ে তা ছুটে বেরিয়ে পড়ে! তার স্পর্শে সে বিদ্যুৎ সমস্ত শরীরে চারিয়ে যায়, শিরের ভিতর গিয়ে রি রি করে।

—'রিণী', তুমি আমাকে আজ এ সব কথা এত করে বল্‌ছ কেন? এতে আমার মন ভুলবে না, শুধু অহঙ্কার বাড়্‌বে।—

আমার অহঙ্কারের নেশা এমনি যথেষ্ট আছে, তার আর মাত্রা চড়িয়ে তোমার কি লাভ?

—সু, যে রূপ আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে, তা তোমার দেহের কি মনের, আমি জানিনে। তোমার মন ও চরিত্রের কতক অংশ অতি স্পষ্ট, আর কতক অংশ অতি অস্পষ্ট। তোমার মুখের উপর তোমার ঐ মনের ছাপ আছে। এই আলোছায়ায় আঁকা ছবিই আমার চোখে এত সুন্দর লাগে, আমার মনকে এত টানে। সে যাই হোক্‌, আজ আমি তোমাকে শুধু সত্যকথা বলছি ও বলব, যদিও তোমার অহঙ্কারের মাত্রা বাড়ানোতে আমার ক্ষতি বই লাভ নেই।

—কি ক্ষতি?

—তুমি জান আর না জান, আমি জানি যে তুমি আমার উপর যা নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ, তার মূলে তোমার অহং ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

—নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি করেছি?

—হাঁ তুমি।—আগের কথা ছেড়ে দাও—এই এক মাস তুমি জান যে আমার কি কষ্টে কেটেছে। প্রতিদিন যখন ডাকপিয়ন এসে দুয়োরে knock করেছে, আমি অমনি ছুটে গিয়েছি—দেখতে তোমার চিঠি এল কি না। দিনের ভিতর দশবার করে তুমি আমার আশা ভঙ্গ করেছ। শেষটা এই অপমান আর সহ্য করতে না পেরে, আমি লণ্ডন থেকে এখানে পালিয়ে আসি।

—যদি সত্যই এত কষ্ট পেয়ে থাক, তবে সে কষ্ট তুমি ইচ্ছে করে ভোগ করেছ—

—কেন?

—আমাকে লিখলেই ত তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তুম।

—ঐ কথাতেই ত নিজেকে ধরা দিলে। তুমি তোমার অহঙ্কার ছাড়্‌তে পার না, কিন্তু আমাকে তোমার জন্য তা ছাড়্‌তে হবে! শেষে হলও তাই। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করে তোমার পায়ে ধরে দিয়েছি, তাই আজ তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে দেখা দিতে এসেছ!

এ কথার উত্তরে আমি বল্লুম—

"কষ্ট তুমি পেয়েছ? তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে অবধি আমার দিন যে কি আরামে কেটেছে, তা ভগবানই জানেন।"

—এ পৃথিবীতে এক জড়পদার্থ ছাড়া আর কারও আরামে থাক্‌বার অধিকার নেই। আমি তোমার জড় হৃদয়কে জীবন্ত করে তুলেছি, এই ত আমার অপরাধ? তোমার বুকের তারে মীড় টেনে কোমল স্বর বার করতে হয়। একে যদি তুমি পীড়ন করা বল, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।

এই সময় আমরা বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, সুমুখে দিগন্ত-বিস্তৃত গোধূলি-ধূসর জলের মরুভূমি ধূ ধূ করছে। তখনও আকাশে আলো ছিল। সেই বিমর্ষ আলোয় দেখ্‌লুম রিণীর মুখ গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। সে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু সে দৃষ্টির কোনও লক্ষ্য নেই। সে চোখে যা ছিল, তা ঐ সমুদ্রের মতই একটা অসীম উদাস ভাব।

'রিণী' আমার হাত ছেড়ে দিলে, আমরা দুজনে বালির উপরে পাশাপাশি বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাক্‌বার পর আমি বল্লুম—"'রিণী' তুমি কি আমাকে সত্যই ভালবাসো ?"

—বাসি।

—কবে থেকে ?

—যে দিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, সেই দিন থেকে। আমার মনের এ প্রকৃতি নয় যে, তা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে উঠবে। এ মন এক মুহূর্তে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, কিন্তু এ জীবনে সে আগুন আর নেভে না। আর তুমি ?

—তোমার সম্বন্ধে আমার মনোভাব এত বহুরূপী যে, তার কোনও একটি নাম দেওয়া যায় না। যার পরিচয় আমি নিজেই ভাল করে জানিনে, তোমাকে তা কি বলে জানাব ?

—তোমার মনের কথা তুমি জান আর না জান, আমি জানতুম্।

—আমি যে জানতুম না, সে কথা সত্য—কিন্তু তুমি জানতে কি না, বলতে পারি নে।

—আমি যে জানতুম, তা ও প্রমাণ করে দিচ্ছি। তুমি ভাবতে যে আমার সঙ্গে তুমি শুধু মন নিয়ে খেলা করছ।

—তা ঠিক।

—আর এ খেলায় তোমার জেতবার এতটা জেদ ছিল যে, তার জন্য তুমি প্রাণপণ করেছিলে।

—এ কথাও ঠিক।

—কবে বুঝলে যে এ শুধু খেলা নয় ?

—আজ।

—কি করে ?

—যখন তোমাকে ষ্টেশনে দেখলুম, তখন তোমার মুখে আমি নিজের মনের চেহারা দেখতে পেলুম।

—এতদিন তা দেখতে পাও নি কেন ?

—তোমার মন আর আমার মনের ভিতর, তোমার অহঙ্কার আর আমার অহঙ্কারের জোড়া পর্দ্দা ছিল। তোমার মনের পর্দ্দার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পর্দ্দাও উঠে গেছে।

—তুমি যে আমাকে কত ভালবাস, সে কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো না।

—কেন ?

—তাও আমি জানি।

—কতটা ?

—জীবনের চাইতে বেশী। যখন তোমার মনে হয় যে আমি তোমাকে ভালবাসি নে, তখন তোমার কাছে বিশ্ব খালি হয়ে যায়, জীবনের কোনও অর্থ থাকে না।

—এ সত্য কি করে জানলে ?

—নিজের মন থেকে।

এই কথার পর 'রিণী' উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "রাত হয়ে গেছে, আমার বাড়ী যেতে হবে, চল তোমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।"—'রিণী' পথ দেখাবার জন্য আগে আগে চলতে লাগল, আমি নীরবে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করলুম।

মিনিট দশেক পরে 'রিণী' বল্‌লে—"আমরা এতদিন ধরে' যে নাটকের অভিনয় করছি, আজ তার শেষ হওয়া উচিত।"

—মিলনান্ত না বিয়োগান্ত?

—সে তোমার হাতে।

আমি বল্লুম—"যারা এক মাস পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, তাদের পক্ষে সমস্ত জীবন পরস্পরকে ছেড়ে থাকা কি সম্ভব?"

—তাহলে একত্র থাকবার জন্য তাদের কি করতে হবে?

—বিবাহ।

—তুমি কি সকল দিক ভেবে চিন্তে এ প্রস্তাব করছ?

—আমার আর কোন দিক ভাব্‌বার চিন্তবার ক্ষমতা নেই। এই মাত্র আমি জানি যে, তোমাকে ছেড়ে আমি আর একদিনও থাকতে পারব না।

—তুমি রোমান ক্যাথলিক হতে রাজি আছ?

এ কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি নিরুত্তর রইলুম।

—এর উত্তর ভেবে তুমি কাল দিয়ো। এখন আর সময় নেই, ওই দেখ তোমার ট্রেণ আসচে—শিগ্‌গির টিকেট কিনে নিয়ে এস, আমি তোমার জন্য ওয়েটিংরূমে অপেক্ষা করব।

আমি তাড়াতাড়ি টিকেট কিনে নিয়ে এসে দেখি রিণী অদৃশ্য হয়েছে। আমি একটি ফার্ষ্টক্লাস গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় সেখান থেকে George নামলেন। আমি ট্রেণে চড়তে না চড়তে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি "রিণী" আর George পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

সে-রাত্তিরে বিকারের রোগীর মাথার যে অবস্থা হয়, আমার তাই হয়েছিল,—অর্থাৎ আমি ঘুমোইও নি, জেগেও ছিলুম না।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবামাত্র চাকরে আমার হাতে একখানি চিঠি দিলে। শিরোনামায় দেখি রিণীর হস্তাক্ষর।

খুলে যা পড়লুম তা এই—

"এখন রাত বারোটা। কিন্তু এমন একটা সুখবর আছে, যা তোমাকে এখনই না দিয়ে থাকতে পারছিনে। আমি এক বৎসর ধরে যা চেয়েছিলুম, আজ তা হয়েছে। George আজ আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছে, আমি অবশ্য তাতে রাজি হয়েছি। এর জন্য ধন্যবাদটা বিশেষ করে তোমারই প্রাপ্য। কারণ George-এর মত পুরুষমানুষের মনে আমার মত রমণীকে পেতেও যেমন লোভ হয়, নিতেও তেমনি ভয় হয়। তাতেই ওদের মনস্থির করতে এত দেরি লাগে যে, আমরা একটু সাহায্য না করলে সে মন আর কখনই স্থির হয় না। ওদের কাছে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে jealousy; ওদের মনে যত jealousy বাড়ে, ওরা ভাবে ওরা তত বেশী ভালবাসে। ষ্টেশনে তোমাকে দেখেই George উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তারপর যখন শুনলে যে তোমার একটা কথার উত্তর আমাকে কাল দিতে হবে, তখন সে আর কালবিলম্ব না করে আমাদের বিয়ে ঠিক করে ফেললে। এর জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইব, এবং তুমিও আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থেকো। কেননা, তুমি যে কি পাগলামি করতে বসেছিলে, তা

পরে বুঝবে। আমি বাস্তবিকই আজ তোমার Saviour হয়েছি।

তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ এই যে, তুমি আমার সঙ্গে আর দেখা করবার চেষ্টা করো না। আমি জানি যে, আমি আমার নতুন জীবন আরম্ভ করলে দু'দিনেই তোমাকে ভুলে যাব, আর তুমি যদি আমাকে শীগ্‌গির ভুলতে চাও, তাহলে Miss Hildesheimer-কে খুঁজে বার করে তাকে বিবাহ কর। সে যে আদর্শ স্ত্রী হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আমি যদি George-কে বিয়ে করে সুখে থাকতে পারি, তাহলে তুমি যে Miss Hildesheimer-কে নিয়ে কেন সুখে থাকতে পারবে না, তা বুঝতে পারি নে। ভয়ানক মাথা ধরেছে, আর লিখতে পারি নে। Adieu!"

এ ব্যাপারে আমি কি George-কে বেশী কৃপার পাত্র, তা আমি আজও বুঝতে পারি নি।

এ কথা শুনে সেন হেসে বললেন "দেখ সোমনাথ, তোমার অহঙ্কারই এ বিষয়ে তোমাকে নির্বোধ করে রেখেছে। এর ভিতর আর বোঝবার কি আছে? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তোমার 'রিণী' তোমাকে বাঁদর নাচিয়েছে এবং ঠকিয়েছে—সীতেশের তিনি যেমন তাকে করেছিলেন। সীতেশের মোহ ছিল শুধু এক ঘণ্টা, তোমার তা আজও কাটে নি। যে কথা স্বীকার করবার সাহস সীতেশের আছে, তোমার তা নেই। ও তোমার অহঙ্কারে বাধে।"

সোমনাথ উত্তর করলেন—

"ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছ, তত নয়। তাহলে আর একটু বলি। আমি 'রিণীর' পরপারে প্যারিসে যাই। মনস্থির

করেছিলুম যে, যতদিন না আমার প্রবাসের মেয়াদ ফুরোয়, ততদিন সেখানেই থাক্‌ব, এবং লণ্ডনে শুধু Innএর term রাখতে বছরে চারবার করে যাব, এবং প্রতি ক্ষেপে ছ'দিন করে থাক্‌ব। মাসখানেক পরে, একদিন সন্ধ্যেবেলা হোটেলে বসে আছি—এমন সময়ে হঠাৎ দেখি 'রিণী' এসে উপস্থিত! আমি তাকে দেখে চমকে উঠে বললুম যে, "তবে তুমি Georgeকে বিয়ে কর নি, আমাকে শুধু ভোগা দেবার জন্য চিঠি লিখেছিলে—?"

সে হেসে উত্তর করলে—

"বিয়ে না করলে প্যারিসে Honeymoon করতে এলুম কি করে? তোমার খোঁজ নিয়ে, তুমি এখানে আছ জেনে, আমি Georgeকে বুঝিয়ে পড়িয়ে এখানে এনেছি। আজ তিনি তাঁর একটি বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছেন, আর আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

সে সন্ধ্যেটা রিণী আমার সঙ্গে গল্প করে কাটালে। সে গল্প হচ্ছে তার বিয়ের রিপোর্ট। আমাকে বসে বসে ও ব্যাপারের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা শুনতে হ'ল। চলে যাবার সময় সে বল্‌লে—

"সেদিন তোমার কাছে ভাল করে বিদায় নেওয়া হয় নি। পাছে তুমি আমার উপর রাগ করে থাক, এই মনে ক'রে আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। এই কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।"

সোমনাথের কথা শেষ হতে না হতে, সীতেশ ঈষৎ অধীর ভাবে বল্‌লেন,—

"দেখ, এ সব কথা তুমি এইমাত্র বানিয়ে বল্‌ছ! তুমি ভুলে গেছ যে খানিক আগে তুমি বলেছ যে, সেই B-তে 'রিণীর'

সঙ্গে তোমার শেষ দেখা। তোমার মিথ্যে কথা হাতে হাতে ধরা পড়েছে!"

সোমনাথ তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করে উত্তর দিলেন "আগে যা বলেছিলুম সেই কথাটাই মিথ্যে—আর এখন যা বলছি তাই সত্যি। গল্পের একটা শেষ হওয়া চাই বলে আমি ঐ জায়গায় শেষ করেছিলুম। কিন্তু প্রকৃত জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা অমন করে শেষ হয় না। সে প্যারিসের দেখাও শেষ দেখা নয়, তারপর লণ্ডনে রিণীর সঙ্গে আমার বহুবার অমন শেষ দেখা হয়েছে।"

সীতেশ বল্লেন—

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনে। এর একটা শেষ হয়েছে, না হয় নি?"

—হয়েছে।

—কি করে?

—বিয়ের বছরখানেক পরেই George-এর সঙ্গে 'রিণীর' ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আদালতে প্রমাণ হয় যে, George রিণীকে প্রহার করতে সুরু করেছিলেন,—তাও আবার মদের ঝোঁকে নয়, ভালবাসার বিকারে। তারপর রিণী Spain-এর একটি Convent-য়ে চির-জীবনের মত আশ্রয় নিয়েছে।

সীতেশ মহা উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "George তার প্রতি ঠিক ব্যবহারই করেছিল। আমি হলেও তাই করতুম।"

সোমনাথ বল্লেন—

"সম্ভবতঃ ও অবস্থায় আমিও তাই করতুম। ও ধর্ম্মজ্ঞান, ও বলবীর্য্য আমাদের সকলেরি আছে। এই জন্যই ত দুর্ব্বলের পক্ষে—

'O crux ! ave unica spera' * এই হচ্ছে মানব মনের শেষ কথা।"

সীতেশ উত্তর করলেন—

"তোমার বিশ্বাস তোমার রিণী একটি অবলা—জান সে
কি ? একসঙ্গে চোর আর পাগল !"

সোমনাথ ইতিমধ্যে একটি সিগ্‌রেট ধরিয়ে, আকাশের দিকে চেয়ে অম্লান বদনে বল্‌লেন—

"আমি যে বিশেষ অনুকম্পার পাত্র এমন ত আমার মনে
হয় না। কেননা পৃথিবীতে যে ভালবাসা খাঁটি,
তার ভিতর পাগলামি ও প্রবঞ্চনা দুইই থাকে, ঐ
টুকুইত ওর রহস্য।"

সীতেশের কাণে এ কথা এতই অদ্ভুত, এতই নিষ্ঠুর ঠেক্‌ল যে, তা শুনে তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কি উত্তর করবেন ভেবে না পেয়ে অবাক্ হয়ে রইলেন।

সেন বললেন "বাঃ সোমনাথ বাঃ ! এতক্ষণ পরে একটা কথার মত কথা বলেচ—এর মধ্যে যেমন নূতনত্ব আছে, তেমনি বুদ্ধির খেলা আছে। আমাদের মধ্যে তুমিই কেবল, মনোজগতে নিত্য নতুন সত্যের আবিষ্কার করতে পারো।"

সীতেশ আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন—

"অতিবুদ্ধির-গলায় দড়ি--এ কথা যে কতদূর সত্য, তোমাদের এই সব প্রলাপ শুনলে তা বোঝা যায় !"—

---

* ক্রুশ্ ! তুমিই জীবনের একমাত্র ভরসা।

সোমনাথ তাঁর কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না, অর্থাৎ কেউ তাঁর লেজে পা দিলে তিনি তখনি উল্টে তাকে ছোবল মারতেন, আর সেই সঙ্গে বিষ ঢেলে দিতেন। যে কথা তিনি শানিয়ে বলতেন, সে কথা প্রায়ই বিষদিগ্ধ-বাণের মত লোকের বুকে গিয়ে বিঁধ্‌ত।

সোমনাথের মতের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যে বিশেষ কোনও মিল ছিল না, তার প্রমাণ ত তাঁর প্রণয়কাহিনী থেকেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। গরল তাঁর কণ্ঠে থাকলেও, তাঁর হৃদয়ে ছিল না। হাড়ের মত কঠিন ঝিনুকের মধ্যে যেমন জেলির মত কোমল দেহ থাকে, সোমনাথের ও তেমনি অতি কঠিন মতামতের ভিতর অতি কোমল মনোভাব লুকিয়ে থাকত। তাই তাঁর মতামত শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত না, যা হত তা' হচ্ছে ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্য, কেননা তাঁর কথা যতই অপ্রিয় হোক, তার ভিতর থেকে একটি সত্যের চেহারা উঁকি মারত,—যে সত্য আমরা দেখতে চাইনে বলে' দেখতে পাইনে।

এতক্ষণ আমরা গল্প বলতে ও শুনতে এতই নিবিষ্ট ছিলুম যে, বাইরের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর আমাদের কারও হয়নি। সকলে যখন চুপ করলেন, সেই ফাঁকে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘ কেটে গেছে, আর চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোয় চারিদিক ভরে' গেছে, আর সে আলো এতই নির্ম্মল, এতই কোমল যে, আমার মনে হ'ল যেন বিশ্ব তার বুক খুলে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে তার হৃদয় কত মধুর আর কত করুণ। প্রকৃতির এ রূপ আমরা নিত্য দেখতে পাই নে বলেই আমাদের মনে ভয় ও ভরসা, সংশয় ও বিশ্বাস, দিন রাত্রিরের মত পালায় পালায় নিত্য যায় আর আসে।

অতঃপর আমি আমার কথা সুরু করলুম।

আমার কথা।

সোমনাথ বলেছেন "Love is both a mystery and a joke"। এ কথা যে এক হিসেবে সত্য, তা' আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য; কেননা এই ভালবাসা নিয়ে মানুষে কবিত্বও করে, রসিকতাও করে। সে কবিত্ব যদি অপার্থিব হয়, আর সে রসিকতা যদি অশ্লীল হয়, তাতেও সমাজ কোন আপত্তি করে না। Dante এবং Boccaccio, উভয়েই এক যুগের লেখক,—শুধু তাই নয়, এর একজন হচ্ছেন গুরু, আর একজন শিষ্য। Don Juan এবং Epipsychidion, দুই কবিবন্ধুতে এক ঘরে পাশাপাশি বসে লিখেছিলেন। সাহিত্য-সমাজে এই সব পৃথকপন্থী লেখকদের যে সমান আদর আছে, তা'ত তোমরা সকলেই জানো।

এ কথা শুনে সেন বল্লেন "Byron এবং Shelley ও-দুটি কাব্য যে এক সময়ে এক সঙ্গে বসে লিখেছিলেন, এ কথা আমি আজ এই প্রথম শুনলুম"।

আমি উত্তর করলুম "যদি না করে' থাকেন, তাহলে তাঁদের তা' করা উচিত ছিল"।

সে যাই হোক, তোমরা যে সব ঘটনা বল্লে, তা নিয়ে আমি তিনটি দিব্যি হাসির গল্প রচনা করতে পারতুম, যা' পড়ে' মানুষ খুসি হত। সেন কবিতায় যা' পড়েছেন, জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন। সীতেশ জীবনে যা' পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন। আর সোমনাথ মানব জীবন থেকে তার কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিন জনই সমান আহাম্মক বনে' গেছেন। কোনও বৈষ্ণব কবি বলেছেন যে, জীবনের পথ "প্রেমে

পিছ্ছিল,"—কিন্তু সেই পথে কাউকে পা পিছলে পড়্‌তে দেখ্‌লে মানুষের যেমন আমোদ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু তোমরা, যে-ভালবাসা আসলে হাস্যরসের জিনিষ, তার ভিতর দু'চার ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে তাকে করুণরসে পরিণত করতে গিয়ে, ও-বস্তুকে এমনি ঘুলিয়ে দিয়েছ যে, সমাজের চোখে তা' কলুষিত ঠেক্‌তে পারে। কেননা সমাজের চোখ, মানুষের মনকে হয় সূর্য্যের আলোয় নয় চাঁদের আলোয় দেখে। তোমরা আজ নিজের নিজের মনের চেহারা যে আলোয় দেখেছ, সে হচ্ছে আজকের রাত্তিরের ঐ ড্রন্ট্ ক্লিন্ট আলো। সে আলোর মায়া এখন আমাদের চোখের সুমুখ থেকে সরে' গিয়েছে। সুতরাং আমি যে গল্প বল্‌তে যাচ্ছি, তার ভিতর আর যাই থাক্ আর না থাক্, কোনও হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর পদার্থ নেই।

এ গল্পের ভূমিকাস্বরূপে আমার নিজের প্রকৃতির পরিচয় দেবার কোন দরকার নেই, কেননা তোমাদের যা' বল্‌তে যাচ্ছি, তা' আমার মনের কথা নয়—আর একজনের,—একটী স্ত্রীলোকের। এবং সে রমণী আর যাই হোক্—চোরও নয়, পাগলও নয়।

গত জুন মাসে আমি কলকাতায় একা ছিলুম। আমার বাড়ী ত তোমরা সকলেই জানো ঐ প্রকাণ্ড পুরীতে রাত্তিরে খালি দু'টি লোক শুত,—আমি আর আমার চাকর। বহুকাল থেকে একা থাক্‌বার অভ্যাস নেই, তাই রাত্তিরে ভাল ঘুম হত না। একটু কিছু শব্দ শুনলে মনে হত যেন ঘরের ভিতর কে আস্‌ছে, অমনি গা ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ত; আর রাত্তিরে জানইত কতরকম শব্দ হয়,—কখনও ছাদের উপর, কখনও

দরজা জানালায়, কখনও রাস্তায়, কখনও বা গাছপালায়। একদিন এই সব নিশাচর ধ্বনির উপদ্রবে রাত একটা পর্য্যন্ত জেগেছিলুম, তারপর ঘুমিয়ে পড়্লুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম যেন কে টেলিফোনে ঘণ্টা দিচ্ছে। অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেই সঙ্গে ঘড়িতে দুটো বাজ্‌ল। তারপর শুনি যে, টেলিফোনের ঘণ্টা একটানা বেজে চলেছে। আমি ধড়্ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। মনে হল যে আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কারও হয়ত হঠাৎ কোন বিশেষ বিপদ ঘটেছে, তাই এত রাত্তিরে আমাকে খবর দিচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে বারান্দায় এসে দেখি আমার ভৃত্যটি অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে। তার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে টেলিফোনের মুখ-নলটি নিজেই তুলে নিয়ে কাণে ধরে বল্লুম—Hallo!

উত্তরে পাওয়া গেল শুধু ঘণ্টার সেই ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। তারপর দু'চার বার "হ্যালো" "হ্যালো" করবার পর একটি অতি মৃদু, অতি মিষ্ট কণ্ঠস্বর আমার কানে এল। জানো সে কি-রকম স্বর? গির্জ্জার অরগানের সুর যখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, আর মনে হয় যে সে সুর লক্ষ যোজন দূর থেকে আস্‌ছে,—ঠিক সেইরকম।

ক্রমে সেই স্বর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ল। আমি শুনলুম কে ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করছে—

"তুমি কি মিষ্টার রায়?"

—হাঁ—আমি একজন মিষ্টার রায়।

—S. D.?

—হাঁ—কাকে চাও?

—তোমাকেই।

গলার স্বর ও কথার উচ্চারণে বুঝলুম, যিনি কথা কচ্ছেন, তিনি একটী ইংরাজ রমণী।

আমি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি কে?"

—চিনতে পারছ না?

—না।

—একটু মনোযোগ দিয়ে শোন ত, এ কণ্ঠস্বর তোমার পরিচিত কিনা।

—মনে হচ্ছে এ স্বর পূর্ব্বে শুনেছি, তবে কোথায় আর কবে, তা' কিছুতেই মনে করতে পারছি নে।

—আমি যদি আমার নাম বলি, তাহলে কি মনে পড়বে?

—খুব সম্ভব পড়বে।

—আমি "আনি"।

—কোন "আনি"?

—বিলেতে যাকে চিনতে।

—বিলেতে ত আমি অনেক "আনি"কে চিনতুম। সে দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ত ঐ একই নাম।

—মনে পড়ে তুমি Gordon Square-এ একটি বাড়ীতে দু'টি ঘর ভাড়া করে' ছিলে?

—তা' আর মনে নেই? আমি যে একাদিক্রমে দুই বৎসর সেই বাড়ীতে থাকি।

—শেষ বৎসরের কথা মনে পড়ে?

—অবশ্য। সেত সেদিনকের কথা; বছর দশেক হল সেখান থেকে চলে এসেছি।

—সেই বৎসর সে-বাড়ীতে "আনি" বলে' একটী দাসী ছিল, মনে আছে?

এই কথা বলবামাত্র আমার মনে পূর্ব্বস্মৃতি সব ফিরে এল। "আনি"র ছবি আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠ্‌ল।

আমি বল্‌লুম "খুব মনে আছে। দাসীর মধ্যে তোমার মত সুন্দরী বিলেতে কখনও দেখিনি"।

—আমি সুন্দরী ছিলুম তা জানি, কিন্তু আমার রূপ তোমার চোখে যে কখনও পড়েছে, তা' জানতুম না।

—কি করে' জান্‌বে? আমার পক্ষে ও কথা তোমাকে বলা অভদ্রতা হত।

—সে কথা ঠিক। তোমার আমার ভিতর সামাজিক অবস্থার অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল।

আমি এ কথার কোনও উত্তর দিলুম না। একটু পরে সে আবার বল্‌লে—

—আমি আজ তোমাকে এমন একটি কথা বল্‌ব, যা তুমি জানতে না।

—কি বল ত?

—আমি তোমাকে ভালবাস্‌তুম।

—সত্যি?

—এমন সত্য যে, দশ বৎসরের পরীক্ষাতেও তা' উত্তীর্ণ হয়েছে।

—এ কথা কি করে জানব? তুমি ত আমাকে কখনও বলো-নি।

—তোমাকে ও-কথা বলা যে আমার পক্ষে অভদ্রতা হত। তা' ছাড়া ও জিনিষ ত ব্যবহারে, চেহারায় ধরা পড়ে। ও কথা অন্ততঃ স্ত্রীলোকে মুখ ফুটে বলে না।

—কই আমি ত কখনও কিছু লক্ষ্য করি নি।

—কি করে' করবে, তুমি কি কখনও মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখেছ? আমি প্রতিদিন আধ ঘণ্টা ধরে' তোমার বসবার ঘরে টেবিল সাজিয়েছি, তুমি সে সময় হয় খবরের কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখ্‌তে, নয় মাথা নীচু করে ছুরি দিয়ে নখ চাঁচ্‌তে।

—এ কথা ঠিক,—তার কারণ, তোমার দিকে বিশেষ করে' নজর দেওয়াটাও আমার পক্ষে অভদ্রতা হত। তবে সময়ে সময়ে এটুকু অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে, আমার ঘরে এলে তোমার মুখ লাল হয়ে উঠত, আর তুমি একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়্‌তে। আমি ভাবতুম সে ভয়ে।

—সে ভয়ে নয়, লজ্জায়। কিন্তু তুমি যে কিছু লক্ষ্য করো নি, সেইটেই আমার পক্ষে অতি সুখের হয়েছিল।

—কেন?

—তুমি যদি আমার মনের কথা জানতে পারতে, তাহলে আমি আর লজ্জায় তোমাকে মুখ দেখাতে পারতুম না। ও-বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতুম। তাহলে আমিও আর তোমাকে নিত্য দেখতে পেতুম না, তোমার জন্যে কিছু করতেও পারতুম না।

—আমার জন্য তুমি কি করেছ?

—সেই শেষ বৎসর তোমার একদিনও কোনও জিনিষের অভাব হয়েছে,—একদিনও কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে?

—না।

—তার কারণ, আমি প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি। জানো তোমাকে যে ভাল না বাসে, সে কখন তোমার সেবা করতে পারে না?

—কেন বল দেখি?

—এই জন্যে যে, তুমি নিজের জন্য কিছু করতে পারো না, অথচ তোমার জন্য কাউকে কিছু করতেও বলো না!

—তুমি যে আমার জন্যে সব করে' দিতে, আমি ত তা' জানতুম না। আমি ভাবতুম Mrs. Smith। তাইতে আসবার সময় তোমাকে কিছু না বলে', Mrs. Smithকে ধন্যবাদ দিয়ে আসি।

—আমি তোমার ধন্যবাদ চাই নি। তুমি যে আমাকে কখনও ধমকাও নি, সেই আমার পক্ষে ছিল যথেষ্ট পুরস্কার।

—সে কি কথা! স্ত্রীলোককে কোনও ভদ্রলোক কি কখনও ধমকায়?

—স্ত্রীলোককে কেউ না ধমকালেও, দাসীকে অনেকেই ধমকায়।

—দাসী কি স্ত্রীলোক নয়?

—দাসীরা জানে তারা স্ত্রীলোক, কিন্তু ভদ্রলোকে সে কথা দু'বেলা ভুলে যায়।

কথাটা এতই সত্য যে, আমি তার কোন জবাব দিলুম না। একটু পরে সে বল্লে—

—কিন্তু একদিন তুমি একটি অতি নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে।

—তোমাকে?

—আমাকে নয়, তোমার একটি বন্ধুকে, কিন্তু সে আমার সম্বন্ধে।

—তোমার সম্বন্ধে আমার কোনও বন্ধুকে কখন কিছু বলেছি বলে' ত মনে পড়্‌ছে না।

—তোমার কাছে সে এত তুচ্ছ কথা যে, তোমার তা মনে থাক্‌বার কথা নয়,—কিন্তু আমার মনে তা' চিরদিন কাঁটার মত বিঁধে ছিল।

—শুনলে হয়ত মনে পড়বে।

—তুমি একদিন একটি মুক্তোর Tie-pin নিয়ে এসো, তার পরদিন সেটি আর পাওয়া গেল না।

—হতে পারে।

—আমি সেটি সারা রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন সময় তোমার একটি বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তুমি তাকে হেসে বললে যে, "আনি" ওটি চুরি করে' ঠকেছে, কেননা মুক্তোটি হচ্ছে ঝুঁটো, আর পিনটি পিতলের; "আনি" বেচতে গিয়ে দেখতে পাবে যে ওর দাম এক পেনি। তারপর তোমরা দু'জনেই হাসতে লাগলে। কিন্তু ঐ কথায় তুমি ঐ পিতলের পিনটি আম বুকের ভিতর ফুটিয়ে দিয়েছিলে।

—আমরা না ভেবে চিন্তে অমন অন্যায় কথা অনেক সময় বলি।

—তা' আমি জানতুম, তাই তোমার উপর আমার রাগ হয় নি,—যা' হয়েছিল সে শুধু যন্ত্রণা। দারিদ্র্যের কষ্টের চাইতে তার অপমান যে বেশী, সেদিন আমি মর্ম্মে

মর্ম্মে তা' অনুভব করেছিলুম। তুমি কি করে' জানবে যে, আমি তোমার এক ফোঁটা ল্যাভেণ্ডারও কখনও চুরি করি নি।

—এর উত্তরে আমার আর কিছু বল্‌বার নেই। না জেনে হয়ত ঐরকম কথায় কত লোকের মনে কষ্ট দিয়েছি।

—তোমার মুক্তোর পিন্ কে চুরি করেছিল, পরে আমি তা' আবিষ্কার করি।

—কে বল ত?

—তোমার ল্যাণ্ডলেডি Mrs. Smith.

—বল কি! সে ত আমাকে মায়ের মত ভালবাস্‌ত। আমি চলে' আসবার দিন তার চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

—সে তার ব্যাঙ্ক ফেল হ'ল বলে'!—তোমাকে সে এক টাকার জিনিষ দিয়ে দু'টাকা নিতো।

—আমি কি তাহলে অতদিন চোখ বুজে ছিলুম?

—তোমাদের চোখ তোমাদের দলের বাইরে যায় না, তাই বাইরের ভালমন্দ কিছুই দেখ্‌তে পায় না। সে যাই হোক্, আমি তোমার একটি জিনিষ না বলে' নতুম—বই,—আবার তা' পড়ে ফিরে দিতুম।

—তুমি কি পড়্‌তে জানতে?

—ভুলে যাচ্ছ আমরা সকলেই Board School-য়ে লেখা-পড়া শিখি।

—হাঁ, তা'ত সত্যি।

—জানো কেন চুরি করে' বই পড়্‌তুম?

—না।

—ভগবান আমাকে রূপ দিয়েছিলেন, আমি তা' যত্ন করে' মেজে ঘসে রাখতুম।

—তা আমি জানি। তোমার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দাসী আমি বিলেতে দেখিনি।

—তুমি যা জানতে না, তা' হচ্ছে এই,—ভগবান আমাকে বুদ্ধিও দিয়েছিলেন, তাও আমি মেজে ঘসে রাখতে চেষ্টা করতুম,—এবং এ দুইই করতুম তোমারই জন্যে।

—আমার জন্যে?

—পরিষ্কার থাকতুম এই জন্যে, যাতে তুমি আমাকে দেখে নাক না শেটকাও; আর বই পড়তুম এই জন্যে, যাতে তোমার কথা ভাল করে' বুঝতে পারি।

—আমি ত তোমার সঙ্গে কখনও কথা কইতুম না।

—আমার সঙ্গে নয়। খাবার টেবিলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি যখন কথা কইতে, তখন আমার তা' শুনতে বড় ভাল লাগত। সে ত কথা নয়, সে যেন ভাষার আতসবাজি! আমি অবাক হয়ে শুনতুম, কিন্তু সব ভাল বুঝতে পারতুম না। কেননা তোমরা যে ভাষা বলতে, তা' বইয়ের ইংরাজি। সেই ইংরাজি ভাল করে' শেখবার জন্য আমি চুরি করে' বই পড়তুম।

—সে সব বই বুঝতে পারতে?

—আমি পড়তুম শুধু গল্পের বই। প্রথমে জায়গায় জায়গায় শক্ত লাগত, তারপর একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোথাও বাধ্ত না!

—কি রকম গল্পের বই তোমার ভাল লাগ্‌ত? যাতে চোর ডাকাত খুন জখমের কথা আছে?

—না, যাতে ভালবাসার কথা আছে। সে যাই হোক্, তোমাকে ভালবেসে তোমার দাসীর এই উপকার হয়েছিল যে, সে শরীরে মনে ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছিল,—তার ফলেই তার ভবিষ্যৎ জীবন এত সুখের হয়েছিল।

—আমি শুনে সুখী হলুম।

—কিন্তু প্রথমে আমাকে ওর জন্য অনেক ভুগ্‌তে হয়েছিল।

—কেন?

—তোমার মনে আছে তুমি চলে' আসবার সময় বলেছিলে যে, এক বৎসরের মধ্যে আবার ফিরে আস্‌বে?

—সে ভদ্রতা করে',—Mrs. Smith দুঃখ করছিল বলে' তাকে স্তোক দেবার জন্যে।

—কিন্তু আমি সে কথায় বিশ্বাস করেছিলুম।

—তুমি কি এত ছেলেমানুষ ছিলে?

—আমার মন আমাকে ছেলেমানুষ করে' ফেলেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা ছেড়ে দিলে, জীবনে যে আর কিছু ধরে' থাকবার মত আমার ছিল না।

—তার পর?

—তুমি যে দিন চলে' গেলে তার পরদিনই আমি Mrs. Smithএর কাছ থেকে বিদায় হই।

—Mrs. Smith তোমাকে বিনা নোটিসে ছাড়িয়ে দিলে?

—না, আমি বিনা নোটিসে তাকে ছেড়ে গেলুম। ও শ্মশান-পুরীতে আমি আর এক দিনও থাক্‌তে পারলুম না।

—তারপর কি করলে ?

—তারপর একবৎসর ধরে' যেখানে যেখানে তোমার দেশের লোকেরা থাকে, সেই সব বাড়ীতে চাকরি করেছি,—এই আশায় যে, তুমি ফিরে এলে সে খবর পাব। কিন্তু কোথাও এক মাসের বেশী থাকতে পারি নি।

—কেন, তারা কি তোমাকে বকত, গাল দিত ?

—না, কটু কথা নয়, মিষ্ট কথা বলত বলে'। তুমি যা' করেছিলে,—অর্থাৎ উপেক্ষা,—এরা কেউ আমাকে তা' করে নি। আমার প্রতি এদের বিশেষ মনোযোগটাই আমার কাছে বিশেষ অসহ্য হত।

—মিষ্টি কথা যে মেয়েদের তিতো লাগে, এ ত আমি আগে জানতুম না।

—আমি মনে আর দাসী ছিলুম না—তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, তাদের ভদ্র কথার পিছনে যে মনোভাব আছে, তা' মোটেই ভদ্র নয়। ফলে আমি আমার রূপ যৌবন দারিদ্র্য নিয়েও সকল বিপদ এড়িয়ে গেছি। জানো কিসের সাহায্যে ?

—না।

—আমি আমার শরীরে এমন একটি রক্ষাকবচ ধারণ করতুম, যার গুণে কোন পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

—সেটি কি Cross ?

—বিশেষ করে' আমার পক্ষেই তা' Cross ছিল,—অন্য কারও পক্ষে নয়। তুমি যাবার সময় আমাকে যে

গিনিটি বক্‌শিস্ দেও, সেটি আমি একটি কালো ফিতে দিয়ে বুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। আমার বুকের ভিতর যে ভালবাসা ছিল, আমার বুকের উপরে ওই স্বর্ণমুদ্রা ছিল তার বাহ্য নিদর্শন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি সেটিকে দেহছাড়া করি নি, যদিচ আমার এমন দিন গেছে যখন আমি খেতে পাই নি।

—এমন এক দিনও তোমার গেছে যখন তোমাকে উপবাস কর্‌তে হয়েছে?

—একদিন নয়, বহুদিন। যখন আমার চাক্‌রি থাক্‌ত না, তখন হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলেই আমাকে উপবাস কর্‌তে হত।

—কেন, তোমার বাপ মা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন কি কেউ ছিল না?

—না, আমি জন্মাবধি একটি Foundling Hospitalয়ে মানুষ হই।

—কত বৎসর ধরে' তোমাকে এ কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়েছে?

—এক বৎসরও নয়। তুমি চলে' যাবার মাস দশেক পরে আমার এমন ব্যারাম হল যে, আমাকে হাঁসপাতালে যেতে হল। সেইখানেই আমি এ সব কষ্ট হতে মুক্তি লাভ করলুম।

—তোমার কি হয়েছিল?

—যক্ষ্মা।

—রোগেরও ত একটা যন্ত্রণা আছে?

—যক্ষ্মা রোগের প্রথম অবস্থায় শরীরের কোনই কষ্ট থাকে না, বরং যদি কিছু থাকে ত সে আরাম। তাই যে ক'মাস আমি হাঁসপাতালে ছিলুম, তা' আমার অতি সুখেই কেটে গিয়েছিল।

—মরণাপন্ন অসুখ নিয়ে হাঁসপাতালে একা পড়ে' থাকা যে সুখের হতে পারে, এ আজ নতুন শুনলুম।

—এ ব্যারামের প্রথম অবস্থায় মৃত্যুভয় থাকে না। তখন মনে হয় এতে প্রাণ হঠাৎ একদিনে নিভে যাবে না। সে প্রাণ দিনের পর দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অলক্ষিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। সে মৃত্যু কতকটা ঘুমিয়ে পড়ার মত। তা ছাড়া, শরীরের ও-অবস্থায় শরীরের কোন কাজ থাকে না বলে' সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখা যায়,—আমি তাই শুধু সুখস্বপ্ন দেখতুম।

—কিসের?

—তোমার। আমার মনে হত যে, একদিন হঠাৎ তুমি এই হাঁসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি নিত্য তোমার প্রতীক্ষা করতুম।

—তার যে কোনই সম্ভাবনা ছিল না, তা কি জানতে না?

—যক্ষ্মা হলে লোকের আশা অসম্ভবরকম বেড়ে যায়। সে যাই হোক, তুমি যদি আসতে তাহলে আমাকে দেখে খুসি হতে।

—তোমার ঐ রুগ্ন চেহারা দেখে আমি খুসি হতুম, এরূপ অদ্ভুত কথা তোমার মনে কি করে' হল?

—সেই ইটালিয়ান পেণ্টারের নাম কি, যার ছবি তুমি এত ভালবাসতে যে সমস্ত দেয়ালময় টাঙ্গিয়ে রেখেছিলে?

—Botticelli.

—হাঁ, তুমি এলে দেখতে পেতে যে, আমার চেহারা ঠিক Botticelliর ছবির মত হয়েছিল। হাত পা গুলি সরু সরু, আর লম্বা লম্বা। মুখ পাতলা, চোখ দুটো বড় বড়, আর তারা দুটো যেমন তরল তেমনি উজ্জ্বল। আমার রং হাতির দাঁতের রংয়ের মত হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠ্‌ত। আমি জানি যে তোমার চোখে সে চেহারা বড় সুন্দর লাগ্‌ত।

—তুমি কতদিন হাঁসপাতালে ছিলে?

—বেশী দিন নয়। যে ডাক্তার আমায় চিকিৎসা করতেন, তিনি মাসখানেক পরে আবিষ্কার করলেন যে, আমার ঠিক যক্ষ্মা হয় নি, শীতে আর অনাহারে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। তাঁর যত্নে ও সুচিকিৎসায় আমি তিন মাসের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠ্‌লুম।

—তারপর?

—তারপর আমার যখন হাঁসপাতাল থেকে বেরবার সময় হল, তখন ডাক্তারটি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি বেরিয়ে কি করব? আমি উত্তর করলুম— দাসীগিরি। তিনি বল্‌লেন যে—তোমার শরীর যখন একবার ভেঙ্গে পড়েছে, তখন জীবনে ওরকম পরিশ্রম করা তোমার দ্বারা আর চলবে না। আমি বল্লুম—উপায়ান্তর নেই। তিনি প্রস্তাব করলেন যে,

আমি যদি Nurse হতে রাজি হই ত তার জন্য যা দরকার, সমস্ত খরচা তিনি দেবেন। তাঁর কথা শুনে আমার চোখে জল এল,—কেন না জীবনে এই আমি সব প্রথম একটি সহৃদয় কথা শুনি। আমি সে প্রস্তাবে রাজি হলুম। এত শীগ্‌গির রাজি হবার আরও একটি কারণ ছিল।

—কি?

—আমি মনে করলুম Nurse হয়ে আমি কলকাতায় যাব। তাহলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমার অসুখ হলে তোমার শুশ্রূষা করব।

—আমার অসুখ হবে, এমন কথা তোমার মনে হল কেন?

—শুনেছিলুম তোমাদের দেশ বড্ড অস্বাস্থ্যকর, সেখানে নাকি সব সময়েই সকলের অসুখ করে।

—তারপরে সত্য সত্যই Nurse হলে?

—হাঁ। তারপরে সেই ডাক্তারটি আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন। আমি আমার মন ও প্রাণ, আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর হাতে সমর্পণ করলুম।

—তোমার বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে?

—পৃথিবীতে যতদূর সম্ভব ততদূর হয়েছে। আমার স্বামীর কাছে আমি যা পেয়েছি সে হচ্ছে পদ ও সম্পদ, ধন ও মান, অসীম যত্ন এবং অকৃত্রিম স্নেহ; একটি দিনের জন্যও তিনি আমাকে তিলমাত্র অনাদর করেন নি, একটি কথাতেও কখন মনে ব্যথা দেন নি।

—আর তুমি?

—আমার বিশ্বাস আমিও তাঁকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসুখী করি নি। তিনি ত আমার কাছে কিছু চান নি, তিনি চেয়েছিলেন শুধু আমাকে ভালবাসতে ও আমার সেবা করতে। বাপ চিররুগ্ন মেয়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, তিনি আমার সঙ্গে ঠিক সেইরকম ব্যবহার করেছিলেন। আমি সেরে উঠলেও আর আগের শরীর ফিরে পাইনি, বরাবর সেই Botticellir ছবিই থেকে গিয়েছিলুম—আর আমার স্বামী আমার বাপের বয়সীই ছিলেন। তাঁকে আমি আমার সকল মন দিয়ে দেবতার মত পূজো করেছি।

—আশা করি তোমাদের বিবাহিত জীবনের উপর আমার স্মৃতির ছায়া পড়ে নি?

—তোমার স্মৃতি আমার জীবন মন কোমল করে' রেখেছিল।

—তাহলে তুমি আমাকে ভুলে যাওনি?

—না। সেই কথাটা বল্‌বার জন্যই ত আজ তোমার কাছে এসেছি। তোমার প্রতি আমার মনোভাব বরাবর একই ছিল।

—বল্‌তে চাও, তুমি তোমার স্বামীকে ও আমাকে দুজনকে একসঙ্গে ভাল বাস্‌তে?

—অবশ্য! মানুষের মনে অনেক রকম ভালবাসা আছে, যা' পরস্পর বিরোধ না করে' একসঙ্গে থাক্‌তে পারে। এই দেখো না কেন, লোকে বলে যে শত্রুকে ভালবাসা শুধু অসম্ভব নয়, অনুচিত;—কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে,

যে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে, তার প্রতিই লোকের সমান মমতা, সমান ভালবাসা হতে পারে।

—এ সত্য কোথায় আবিষ্কার করেছ?

—ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে।

—তুমি সেখানে কি কর্‌তে গিয়েছিলে?

—বল্‌ছি। এই যুদ্ধে আমরা দুজনেই ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলুম, তিনি ডাক[illegible] হিসেবে, আমি Nurse হিসেবে—সেইখান [illegible] এই তোমার কাছে আস্‌ছি, যে কথা আগে ব[illegible] সুযোগ পাইনি, সেই কথাটি বল্‌বার জন্য।

—তোমার কথা আমি [illegible] বুঝতে পারছি নে।

—এর ভিতর হেঁয়ালি কিছু নেই। এই ঘণ্টাখানেক আগে তোমার সেই Botticellia ছবি একটি জর্ম্মাণ গোলার আঘাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—অমনি আমি তোমার কাছে চলে' এসেছি।

—তাহলে এখন তুমি?

—পরলোকে।

এর পর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরে চলে' এলুম। মুহূর্ত্তে আমার শরীর মন একটা অস্বাভাবিক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এল। আমি শোবামাত্র ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। তার পরদিন সকালে চোখ খুলে দেখি বেলা দশটা বেজে গেছে।

* * * * * *

কথা শেষ করে' বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখি, রূপকথা শোনবার সময় ছোট ছেলেদের মুখের যেমন ভাব হয়, সীতেশের মুখে ঠিক সেই ভাব। সোমনাথের মুখ কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। বুঝলুম তিনি নিজের মনের উদ্বেগ জোর করে চেপে রাখছেন। আর সেনের চোখ ঢুলে আসছে,—ঘুমে কি ভাবে, বলা কঠিন। কেউ 'হঁ' 'না' ও করলেন না। মিনিট খানেক পরে বাইরে গির্জ্জের ঘণ্টায় বারোটা বাজলে, আমরা সকলে এক সঙ্গে উঠে পড়ে' boy boy বলে' চীৎকার করলুম, কেউ সাড়া দিলে না। ঘরে ঢুকে দেখি, চাকরগুলো সব মেজেতে বসে' দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমচ্ছে। চাকরগুলোকে টেনে তুলে গাড়ী জুত্তে বলতে নীচে পাঠিয়ে দিলুম।

হঠাৎ সীতেশ বলে' উঠলেন "দেখ রায়, তুমি একজন লেখক, দেখো এ সব গল্প যেন কাগজে ছাপিয়ে দিয়ো না, তাহলে আমি আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারব না"। আমি উত্তর করলুম "সে লোভ আমি সম্বরণ করতে পারব না তাতে তোমরা আমার উপর খসিই হও, আর রাগই করো"। সেন বল্লেন "আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি যা' বল্লুম তা আগাগোড়া সত্য, কিন্তু সকলে ভাববে যে তা' আগাগোড়া বানানো"। সোমনাথ বল্লেন "আমারও কোনও আপত্তি নেই, আমি যা' বল্লুম তা আগাগোড়া বানানো, কিন্তু লোকে ভাববে যে তা' আগাগোড়া সত্যি"। আমি বললুম, "আমি যা' বল্লুম তা' ঘটেছিল, কি আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, তা' আমি নিজেও জানি নে। সেই জন্যই ত এ সব গল্প লিখে ছাপাব। পৃথিবীতে দু'রকম কথা আছে যা' বলা অন্যায়,—এক হচ্ছে মিথ্যা, আর এক হচ্ছে সত্য। যা' সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, আর না হয়ত একই সঙ্গে দুই,—তা বলায় বিপদ নেই।

সীতেশ বল্লেন "তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের একজন কবি, একজন ফিলজফার, আর একজন সাহিত্যিক,—সুতরাং তোমাদের কোন্ কথা সত্য আর কোন্ কথা মিথ্যে, তা' কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি হচ্ছি সহজ মানুষ, হাজারে ন'শ নিরনব্বই জন যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। আমার কথা যে খাঁটি সত্য, পাঠকমাত্রেই তা' নিজের মন দিয়েই যাচাই করে' নিতে পারবে।"

আমি বল্লুম—"যদি সকলের মনের সঙ্গে তোমার মনের মিল থাকে, তাহলে তোমার মনের কথা প্রকাশ করায় ত তোমার লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই"। সীতেশ বল্লেন, "বাঃ, তুমিত বেশ বল্লে! আর পাঁচজন যে আমার মত, এ কথা সকলে মনে মনে জানলেও, কেউ মুখে তা' স্বীকার করবে না, মাঝ থেকে আমি শুধু বিদ্রূপের ভাগী হব।" এ কথা শুনে সোমনাথ বল্লেন, "দেখ রায়, তাহলে এক কাজ করো,—সীতেশের গল্পটা আমার নামে চালিয়ে দেও, আর আমার গল্পটা সীতেশের নামে"! এ প্রস্তাবে সীতেশ অতিশয় ভীত হয়ে বল্লেন, "না না, আমার গল্প আমারই থাক্। এতে নয় লোকে দুটো ঠাট্টা করবে, কিন্তু সোমনাথের পাপ আমার ঘাড়ে চাপলে আমাকে ঘর ছাড়্তে হবে"!—

এর পরে আমরা সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করলুম।

জানুয়ারি, ১৯১৬।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-এ্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।